কি পেলাম

কাসেম বিন আবুবাকার

প্রকাশক
মোঃ সায়ফুল্লাহ খাঁন
নূর-কাসেম পাবলিশার্স
৩৮/১ দক্ষিণ মুগদাপাড়া
বাসাবো, ঢাকা-১২১৪।

প্রথম প্রকাশ–১৯৯৩ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ–১৯৯৫ইং
তৃতীয় প্রকাশ–১৯৯৭ইং

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

অক্ষরবিন্যাস
বাঁধন কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার (দোতলা)
ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
কাকলী প্রকাশনী
শিখা প্রকাশী
আফসার ব্রাদার্স
অনুপম প্রকাশনী
মম প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সালাউদ্দিন বইঘর
৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী মুদ্রণ সংস্থা
৩০/৫, নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০।

দাম ৫০ টাকা

ভূমিকা

"পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি"

এবারে বইটির তৃতীয় সংস্করণ "নূর-কাসেম পাবলিশার্স" থেকে প্রকাশিত হল। বিগত সংস্করণগুলোতে বইটিতে অনেক ভুল-ত্রুটি ছিল। সে-সব সংশোধন করে নূতন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হল।

এই উপন্যাসের কাহিনী একটা গ্রাম্য সংসারের বাস্তব পটভূমিকা নিয়ে। এর নায়ক মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক শহরে চাকরি করে। যারা স্ত্রী-ছেলেমেয়ে দেশে রেখে বিদেশে চাকরি করে, তাদের ও তাদের পরিজনবর্গের জীবন কাহিনী এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। আরো এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যা পড়ে পাঠকবর্গ আনন্দ ও বেদনার সাথে সাথে সমাজের অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন। প্রবাদ আছে, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।" কথাটা আমরা প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু এই কাহিনীর নায়িকা সর্বগুণে গুণান্বিতা হয়েও কেন তার সংসার সুখের হল না, এই কাহিনীটা পড়ে প্রবাদ বাক্যটা সত্য না মিথ্যা আপনারা বুঝতে পারবেন। আর যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথায় বলছি, "সবকিছুর মূলে রয়েছে তক্বদির। যার তক্বদিরে যতটুকু সুখ শান্তি থাকে তা যেমন কেউ কম-বেশি করতে পারে না, তেমনি যতটুকু দুঃখ-কষ্ট থাকে তাও কেউ কম-বেশি করতে পারে না। এই কাহিনীটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

'ওয়াস সালাম'

২৮শে শ্রাবণ ১৪০০ বাংলা
৭ই রবিউস সানি ১৪১৪ হিঃ
১৫ই আগষ্ট ১৯৯৭ইং

"যাহারা কেবল পার্থিব জীবন ও উহার জাঁক-জমক কামনা করে, তবে আমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মগুলি-র ফল দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করিয়া দিই এবং দুনিয়াতে তাহাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। ইহারা এমন লোক যে, তাহাদের জন্য আখিরাতে দোযখ ভিন্ন আর কিছুই নাই, আর তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহা সমস্তই আখিরাতে অকেজো হইবে এবং যাহা কিছু করিতেছে তাহাও বিফল হইবে।"

—আল-কুরআন, সূরা-হুদ, ১৫/১৬ আয়াত, পারা-১২

উৎসর্গ

যে সমস্ত নারী স্বামী

ও

তার পরিবারবর্গের সুখ-শান্তির জন্য

নিঃশর্ত অবদান রেখেছেন।

লেখকের রচিত বই

❑ কি পেলাম ❑ ফুটন্ত গোলাপ ❑ হঠাৎ দেখা ❑ প্রেম যেন এক সোনার হরিণ ❑ প্রেমের ফসল (ছোট গল্প) ❑ধনীর দুলালী ❑ আধুনিকা ❑ প্রতিবেশিনী ❑ কেউ ভোলে কেউ ভোলে না ❑ পল্লীবালা ❑ আজরাইল (আঃ)-এর কান্না (কিশোর গল্প) ❑ বড় আপা ❑ কালো মেয়ে ❑ বিয়ের খোঁপা (ছোট গল্প) ❑ পলাতকা ❑ বিকেলে ভোরের ফুল ❑ কামিনী কাঞ্চন ❑ স্বর্ণতুমি ❑ বহুরূপিনী ❑ বধূয়া ❑ হৃদয় যমুনা ❑ অনন্ত প্রেম ❑ শেষ উপহার ❑ হৃদয়ে আঁকা ছবি ❑ প্রেম ও স্বপ্ন ❑ ভাঙ্গাগড়া ❑ তোমার প্রত্যাশায় ❑ কে ডাকে তোমায় (প্রকাশিতব্য) ❑ অচেনা পথিক ❑ বিয়ে বিভ্রাট ❑ তুমি সুন্দর ❑ কলঙ্কের ফুল ❑ শহরের মেয়ে (প্রকাশিতব্য) ❑ প্রেম বেহেশতের ফল ❑ পাহাড়ী ললনা ❑ বিলম্বিত বাসর ❑ ক্রন্দসী প্রিয়া ❑ বিদেশী মেম ❑ শ্রেয়সী ❑ বিদায় বেলায় ❑ একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল ❑ শরীফা ❑ প্রেমের পরশ ❑ অবশেষে মিলন ❑ ভালবাসি তোমাকেই ❑ অসম প্রেম ❑ প্রেম ❑ প্রতিক্ষা ❑ অবাঞ্ছিত উইল ❑ চেনা মেয়ে ❑ কাঙ্ক্ষিত জীবন ❑ সংসার ❑

চাঁদপুর জেলার চার নাম্বার পশ্চিম মবিদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বদরপুর গ্রাম। এই গ্রামে শফিউদ্দিন নামে একজন উচ্চি মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন। উনি ও ওঁর স্ত্রী সাত বছরের একটা ছেলে ও দশ বছরের একটি মেয়ে রেখে এক বছরের মধ্যে মারা যান। ছেলেটার নাম শাহেদ আলী আর মেয়েটির নাম করিমন। মা বাবা মারা যাওয়ার পর দু'ভাইবোন নানার বাড়ি, খালার বাড়ি ও চাচাদের কাছে মানুষ হতে লাগল। শাহেদ আলী নানার বাড়ি থেকে প্রাইমারী পর্যন্ত পড়ে আর পড়াশুনা করল না। বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে মানুষ হতে লাগল। জ্ঞান হওয়ার পর এখানে ওখানে অনেক রকম কাজকর্ম করল। তারপর ব্যবসা করে বেশ সাবলম্বী হয়ে উঠল। এদিকে করিমন বড় হয়ে যাওয়ার পর চাচারা তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আরো কিছুদিন পর শাহেদ আলীর চাচারা ভিনো হয়ে গেল। শাহেদ আলী পৈত্রিক দু'কামরা পাকা ঘর ও বিঘে তিনেক ফসলি জমি পেল। সে খুব পরিশ্রমী ছেলে। কিছুদিনের মধ্যে বেশ গুছিয়ে উঠল।

বদরপুর গ্রামের মাইল দেড়েক উত্তরে বাকিলাহ গ্রামের জয়নুদ্দিন বেশ অবস্থাপন্ন লোক। ওঁর এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে কামাল বড়। আর মেয়ে মেহেরুন্নেসা ছোট।

কামাল এস.এস.সি. পাশ করে বাবার সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে। মেহেরুন্নেসা ক্লাশ নাইনে উঠার পর মেয়ের বাড়ন্ত চেহারা দেখে জয়নুদ্দিন তাকে আর স্কুলে পড়ালেন না। মেয়ের বিয়ের বয়স হতে তিনি পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। বদরপুরের শাহেদ আলীর খবর পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ছেলেটা এতিম হলেও কর্মঠ এবং ধার্মিক। অবস্থাও খুব একটা খারাপ না। চিন্তা করলেন, ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর ও জায়েদের কোনো ঝামেলা তাকে পোহাতে হবে না। খুব নির্ঝঞ্ঝাটে সংসার করতে পারবে। তবে ছেলেটা মেয়ের চেয়ে কম লেখাপড়া করেছে। এটাই শুধু একটা বাধা। জয়নুদ্দিন স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করার সময় শাহেদ আলীর কথা বলে বললেন, হোক সে মেহেরুন্নেসার থেকে কম শিক্ষিত, তবুও আমি তাকেই জামাই করব। মেহেরুন্নেসা আমাদের খুব চালাক মেয়ে। অল্পদিনেই সংসারে উন্নতি করতে পারবে। স্ত্রী বেশি শিক্ষিত হলে স্বামী তাকে মেনে গুনে চলে। মেয়ে আমাদের সুখী হবে।

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী মাহফুজা বিবি অমত করলেন না। কিন্তু বাবার কথা শুনে কামাল বলল, আপনি যখন ভালো মনে করছেন তখন আর অমত করব না। তবে মেহেরুন্নেসা যদি ছেলে তার চেয়ে কম শিক্ষিত জেনে মনে কষ্ট পায়?

জয়নুদ্দিন বললেন, সেরকম বুঝলে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব। তারপর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি মেহেরুন্নেসার সঙ্গে আলাপ করে আমাকে জানিও।

মেহেরুন্নেসার গায়ের রং ফর্সা না হলেও দেখতে মোটামুটি ভালই। সুন্দর স্বাস্থ্য। গোলগাল চেহারা! বাবা স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেও বাড়িতে রীতিমত পড়াশুনা করে। দু'ভাইবোনের মধ্যে খুব মিল। বোনের পড়াশুনার ঝোঁক দেখে কামাল তাকে ভালো ভালো গল্পের বই জোগাড় করে দেয়। অনেক ধর্মীয় বইও কিনে দেয়।

মেহেরুন্নেসা সব ধরণের বই পড়তে ভালবাসে। সংসারের কাজেও খুব পটু। মাকে কোনো কাজ করতে দেয় না। বেশ চটপটে মেয়ে। কিন্তু খুব ধার্মিক।

মাহফুজা বিবি একদিন মেয়েকে তার বাবার কথা জানিয়ে মতামত জানতে চাইলেন।

মেহেরুন্নেসা বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

মেয়ে লজ্জা পেয়েছে বুঝতে পেরে মাহফুজা বিবি বললেন, এতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? তোর আব্বার মুখে ছেলেটার কথা যা শুনলাম, তাতে আমার মনে হয়, তুই সুখে থাকবি। ছেলেটা তোর থেকে কম লেখাপড়া করেছে এই যা। চুপ করে থাকিস না, তোর আব্বা জিজ্ঞেস করলে কি বলব বল?

মেহেরুন্নেসা আরো অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নিচু করেই বলল, তোমরা যদি ভালো মনে কর, তবে আমার অমত নেই। তারপর সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

জয়নুদ্দিন স্ত্রীর মুখে মেয়ের মতামত জেনে খুশি হলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যে শাহেদ আলীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করলেন।

মেহেরুন্নেসা স্বামীর ঘরে এসে স্বামীকে মন প্রাণ উজাড় করে ভালবেসে খেদমত করতে লাগল। সেই সঙ্গে সংসারের উন্নতির জন্য তাকে পরামর্শ দিতে লাগল।

শাহেদ আলী নিজে যেমন ধার্মিক ও সংসারী, স্ত্রীকেও সেরকম দেখে যারপরনাই খুশি হয়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

বিয়ের তিন বছর পর তাদের ঘর আলো করে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। শাহেদ আলী সাতদিনে দুটো খাসি জবেহ করে ছেলের নাম রাখলেন জাহেদ। তারপর দু'তিন বছর অন্তর তাদের আরো দুই ছেলে ও তিন মেয়ে জন্মাল। মেয়েদের নাম কুলসুম, রোকেয়া ও জুলেখা। আর ছেলেদের নাম বখতিয়ার ও বাহাদুর। বাহাদুর সকলের ছোট। সংসার বেড়ে যাওয়ায় শাহেদ আলী নিজের ও শ্বশুরের চেষ্টায় কাতার চলে গেলেন। প্রথমবারে দু'বছর পরে আসেন। তারপর বছরে একবার করে আসতে লাগলেন।

এদিকে মেহেরুন্নেসা সংসারের হাল ধরলেন। তিনি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে লাগলেন।

জাহেদ এইচ. এস. সি. পাশ করার পর শাহেদ আলী ছেলেকেও কাতারে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি এতদিন কাতারে গিয়ে সংসারের অনেক উন্নতি করেছেন। ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার পর দিন দিন তাদের আরো উন্নতি হতে লাগল।

জাহেদের পরেই কুলসুম। ডাক নাম রূপা। রূপা যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন একজন ঘটক তার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। শাহেদ আলী কয়েকদিন আগে কাতার থেকে দেশে ফিরেছেন। তিনি এত ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। ঘটককে বললেন, আমার মেয়ে ছোট। তাছাড়া মেয়েকে আমি এস.এস.সি. পর্যন্ত অন্তত পড়াব। তারপর বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করব।

বাকিলাহ গ্রামেই ঘটকের বাড়ি। শাহেদ আলী ও তার শ্বশুর জয়নুদ্দিনকে ভালভাবে চেনে। এই কাজ করাতে পারলে তাদের কাছ থেকে মোটা বখশিস যে পাওয়া যাবে, তা সে খুব ভালভাবে জানে। তাই শাহেদ আলীকে রাজি করাতে না পেরে তার শাশুড়ী রহিমন বিবি ও শ্বশুর জয়নুদ্দিনকে গিয়ে ধরল। পাত্রের ও পাত্রের বাবার অবস্থা এবং তাদের বাড়ির সকলের গুণাগুণ করে বলল, পাত্র শিক্ষিত। ইরাকে চাকরি করে।

দেখতে শুনতে খুব ভালো। তারপর নানারকম চাল খেলে তাদের মন জয় করে ফেলল। রহিমন বিবি ও জয়নুদ্দিন সাবেক কালের মানুষ। তারা মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিতে পছন্দ করেন। তাই রাজি হয়ে গেলেন।

শাহেদ আলী ছেলেবেলায় এতিম হয়ে মা-বাবার স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিয়ের পর শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহ মমতা পেয়ে তাদেরকে নিজের মা-বাবার মত মনে করতেন। তারা যখন রূপার বিয়ে দেবার জন্য বললেন, তখন আর না করতে পারলেন না। শেষে তাদের মনে কষ্ট হবে ভেবে বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করে কাতার চলে গেলেন। কারণ ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই যাওয়ার সময় সমন্ধি কামালকে বললেন, রূপার বিয়েটা যেন ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

শাহেদ আলী বিদেশ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন পাত্রের বাবা এসে জয়নুদ্দিনকে বললেন, আমরা আপনার নাতনিকে বৌ করতে পারব না। এ বিয়ে হবে না।

জয়নুদ্দিন খুব অবাক হয়ে বললেন, কেন?

পাত্রের বাবা বললেন, আপনাদের চেয়ে আরো বড় ঘরের মেয়ে আমরা দেখেছি। সেই মেয়ে আপনার নাতনির থেকে অনেক বেশি সুন্দরী।

জয়নুদ্দিন শুনে খুব রেগে গেলেন। বললেন, এ আপনি কি বলছেন? যেখানে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে, সেখানে এমন কথা বলতে পারলেন? আমার জামাই মেয়ে ছোট বলে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। আমি বলে কয়ে রাজি করালাম। আপনারা মেয়ে দেখে পছন্দ করে সব ঠিকঠাক করে গেলেন। এখন আবার একি কথা বলছেন? আপনারা কি মানুষ? একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবনে দাগ দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এই মেয়ের বিয়ে কি করে হবে, সে কথা চিন্তা করেছেন?

পাত্রের বাবা বললেন, আপনারা যাই বলুন না কেন, আমরা বিয়ে ভেঙ্গে দিলাম। আমরা বড় ঘরের মেয়ে বৌ করব। তারা আপনাদের থেকে অনেক বেশি বড়লোক। সেখানে পাকা কথাবার্তা হয়ে গেছে।

জয়নুদ্দিন আরো রেগে গিয়ে বললেন, আমাদের অবস্থা জেনে শুনেই তো আপনারা এই বিয়ে ঠিক করেছিলেন। এখন আবার গরিব বড়লোকের কথা বলছেন কেন? আপনাদের গায়ে কি একটুও মানুষের চামড়া নেই?

পাত্রের বাবা বললেন, আপনারা যা খুশি বলতে পারেন, তবু আমরা এই কাজ করব না। এ ব্যাপারে আপনাদের যা খরচপাতি হয়েছে বলুন, দিয়ে দিচ্ছি।

কামাল এতক্ষণ বাড়িতে ছিল না। এসে সবকিছু শুনে পাত্রের বাবার সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি করল। পাত্রের বাবা তাদের কোনো কথায় কর্ণপাত না করে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেলেন।

জয়নুদ্দিন স্ত্রী ও কামালকে নিয়ে বদরপুরে এসে মেয়েকে রূপার বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বললেন।

মেহেরুন্নেসা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন, এ কথা আমি তোমাদের জামাইকে জানাব কেমন কর? সে এখন রূপার বিয়ে দিতে একদম রাজি ছিল না। শুধু আপনাদের কথায় রাজি হয়েছিল। এখন আবার এই কথা জেনে কি করবেন কি জানি?

কামাল বলল, বুবু তুমি কেঁদ না। সবুর কর। আমি রূপার বাবাকে চিঠি দিয়ে বুঝিয়ে বলব। আর তোমরা দোওয়া কর, ইনশাআল্লাহ আমি যেন রূপার বিয়ে অতি শীঘ্র দিতে পারি।

জয়নুদ্দিনও মেয়েকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, তুই কিছু চিন্তা করিস না। আমি তোর মেয়ের বিয়ে তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

বিয়ে ভেঙ্গে গেছে শুনে রূপার তরুণী মনে বেশ আঘাত লাগল। এরপর তাকে সবাই অপয়া মেয়ে বলে খোটা দেবে, পরে অন্য কোথাও বিয়ে হলেও তাকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা অনেক কথা শোনাবে, এইসব ভেবে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

মেহেরুন্নেসা মেয়ের মন খারাপ দেখে একদিন তাকে বললেন, তুই আবার স্কুলে যা।

বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর রূপা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। মায়ের কথা শুনে বলল, আমার বিয়ের কথা স্কুলের মাস্টাররা ও ছাত্রীরা অনেকে জেনে গেছে। তারা যখন কিছু জিজ্ঞেস করবে তখন কি বলব? আমি আর স্কুলে যাব না।

মেহেরুন্নেসা আর কিছু বলতে পারলেন না।

এই ঘটনার চার পাঁচ মাসের মধ্যে কামাল চেষ্টা চরিত্র করে বড় ঘরে ভাগনির বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের কাজটা খুব তড়িঘড়ি করতে হল বলে রূপার বাবাকে জানাতে পারল না। বিয়ের পর চিঠিতে বিস্তারিত জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিল।

রূপার ভাগ্য খুব ভালো। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও দেবর ননদেরা তাকে খুব ভালবাসে। তার স্বামীরা চার ভাই ও তিন বোন। সে-ই বাড়ির বড় বৌ। দু'ননদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট পড়াশুনা করছে।

রূপার যখন বিয়ে হয় তখন তার মেজ বোন রোকেয়া ক্লাস সিক্সে পড়ে। ওদের বাড়ির সামনে দুটো পুকুর আছে। একটা ব্যবহার হয়। অন্যটা হয় না। সেটাতে শাপলা গাছে ভরা। একদিন দুপুরে রোকেয়া পাশের বাড়ির সমবয়সী মেয়ে নূরনাহারকে সাথে নিয়ে শাপলা তোলার জন্য পুকুরে নামল। কিনারেরগুলো তুলে একটু দূরে তুলতে গিয়ে দু'জনেই ডুবে গেল। নূরনাহার সাঁতার জানত। সে সাঁতরে কিনারে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, রুকু তুই হাত উঠা।

রোকেয়া তখন ডুবে গিয়ে পানি খাচ্ছে। হঠাৎ নূরনাহারের কথা শুনতে পেয়ে হাত উঠাল। অমনি নূরনাহার রোকেয়ার হাত ধরে টেনে তুলে ফেলল। ততক্ষণে রোকেয়া বেশ খানিকটা পানি খেয়ে ফেলেছে। নূরনাহার পাড়ে উঠে রোকেয়াকেও ধরে উঠাল। আসলে পুকুরটায় পানি কম ছিল বলে এবং আল্লাহ পাক রোকেয়ার হায়াৎ রেখেছিল বলে সে যাত্রা বেঁচে গেল। এরপর থেকে রোকেয়া পানিকে ভীষণ ভয় করে। পুকুরে নেমে কোনোদিন আর গোসল করে না। পুকুর থেকে বালতিতে পানি তুলে পাড়ে গোসল করে। বৃষ্টির দিনে উঠোনে পানি জমে গেলে ভয়ে উঠোনেও নামে না। তাই দেখে অন্যান্য ভাইবোনেরা তাকে জোর করে উঠোনে নামায়। রোকেয়া তখন কান্নাকাটি করে। জাহেদ ও রূপা হেসে হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বলে তুই যে এই সামান্য বৃষ্টির পানিকে এত ভয় করছিস, যখন বন্যা হবে তখন কি করবি? আমরা তো সাঁতার জানি। সাঁতার কেটে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেব। তুই তো সাঁতার জানিস না, ডুবে মরবি। এই কথায় রোকেয়া আরো কান্নাকাটি করে। শেষে মেহেরুন্নেসা তাদেরকে ধমক দিয়ে রোকেয়ার কান্না থামান।

রোকেয়া দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও সুন্দরী। পড়াশুনায় খুব ভালো। স্কুলে তার অনেক বান্ধবী। ক্লাস সেভেনে উঠার পর লাকি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়। তাদের বাড়ি রোকেয়াদের বাড়ির কাছাকাছি। মাত্র দু'তিনিটে জমির পর।

দু'জনের গলায় গলায় ভাব। রাত ছাড়া সারাদিন এক সঙ্গে থাকে। কেউ কাউকে এক মিনিট না দেখে থাকতে পারে না। অসুখ বিসুখ হলে বা অন্য কোনো কারণে একজন স্কুলে না গেলে অন্যজনও যাবে না। একদিন রোকেয়া লাকিকে না বলে নানির বাড়ি গেল। সেদিন লাকি স্কুলে গেল না। পরের দিন রোকেয়া ফিরে এলে আঁশুভরা চোখে বলল, তুই আমাকে না বলে কোথাও যাবি না বল?

রোকেয়া তার চোখের আশু মুছে দিয়ে বলল, তুই আমাকে এত ভালবাসিস? আমারো কিন্তু নানির বাড়িতে তোর জন্য মন খারাপ হয়েছিল। তাইতো, নানি থাকতে বললেও থাকিনি।

লাকি বলল, আমার খুব ইচ্ছা হয়, তোকে সব সময় আমার কাছে রাখি। তোকে ছাড়া আমি একদম থাকতে পারি না।

রোকেয়া বলল, আমারো তোর মত ইচ্ছা হয়। আচ্ছা লাকি, এখন তো আমরা এক সাথে থাকি; কিন্তু যখন আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে তখন কি করব?

এক কাজ করব, তোর বা আমার যার আগে বিয়ে হবে, সে অন্যকে তার দেবরের জন্য নিয়ে যাব। তাহলে আর ছাড়াছাড়ি হবে না।

রোকেয়া হেসে উঠে বলল, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু দেবর যদি না থাকে অথবা ছোট হয়, তখন কি হবে?

তাহলে যার আগে বিয়ে হবে, সে অন্যকে সতীন কর নিয়ে যাবে। তাহলে চিরজীবন এক সাথে থাকতে পারব।

কথাটা মন্দ বলিসনি। কিন্তু এক স্বামীর কাছে দু'জনে এক সাথে থাকব কেমন করে?

কেন? স্বামীকে মাঝখানে রেখে দু'জন দু'পাশে থাকব।

তুই না বড় দুষ্ট হয়ে গেছিস।

এতে দুষ্টু হবার কি হল? আমরা দু'জনেই যেমন স্বামীকে পেলাম তেমনি একসাথেও থাকলাম।

এখন এরকম বলছিস, কিন্তু তখন আর বলবি না। মেয়েদের সব থেকে বড় দুশমন হল সতীন। স্বামীকে একা পাওয়ার জন্য সতীনকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবি। জানিস না, মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে সতীনের জ্বালা সহ্য করতে পারে না?

তুই এসব জানলি কি করে?

আম্মা একদিন আব্বাকে বলছিল, তার এক খালাত বোন সতীনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে মরে গেছে।

রোকেয়া বলল, তা হয়তো হবে।

এভাবে দিন গড়িয়ে চলল। রোকেয়া ও লাকি এখন ক্লাস টেনে পড়ছে। শাহেদ আলী আর কাতার যাননি। জাহেদকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দেওয়ার দু'তিন বছর পর থেকে তিনি বাড়িতেই আছেন।

একদিন রোকেয়া জ্বর নিয়ে স্কুল থেকে ফিরল। শাহেদ আলী ডাক্তার এনে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। কিন্তু জ্বর কমা যেমন তেমন বেড়েই চলল। শেষে শাহেদ আলী অন্য ডাক্তার আনলেন।

তিনি রোকেয়াকে পরীক্ষা করার পর আগের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখে বললেন, রোগী ভাল হবে কি করে? আপনার মেয়ের টাইফয়েড হয়েছে, আর উনি

ফোড়ার ওষুধ দিয়েছেন। তারপর প্রেসক্রিপশন করে বললেন, আগের ওষুধ খাওয়াবেন না, এগুলো এনে খাওয়ান।

এই অসুখে রোকেয়া প্রায় দেড়মাস ভুগল। সে সময় লাকি সারাদিন রোকেয়ার কাছে থেকেছে। অনেক দিন স্কুল ও কামাই করেছে। রোকেয়া স্কুলে যেতে বললেও যায়নি।

অসুখ ভালো হয়ে যাওয়ার মাস দু'য়েক পর একদিন রোকেয়া জুলেখাকে নিয়ে বাকিলাহ বাজার নানার বাড়িতে বেড়াতে গেল। লাকিকেও আসার জন্য বলেছিল। তার মায়ের অসুখের জন্য আসতে পারল না।

নানার বাড়ি এসে শুনল, পাশের গ্রামের দূর সম্পর্কের এক মামার বিয়ে। তারা দাওয়াত দিয়ে গেছে। রোকেয়ার নানা-নানি আগের দিন চলে গেছেন। পরের দিন রোকেয়ার মামী রোকেয়াকে বললেন, তোর মামা কাজের ঝামেলায় যেতে পারবে না। তুই জুলেখা, মনোয়ারা ও মানিককে নিয়ে যা। মনোয়ারাও মানিক রোকেয়ার মামাতো ভাই বোন। মনোয়ারা রোকেয়ারএক বছরের ছোট। মানিক তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হল। কিন্তু মানিক যেতে রাজি হল না।

রোকেয়া তাকে বলল, আমরা তিনটে মেয়ে একা একা যাব কেমন করে? তুই যাবি না কেন?

রোকেয়ার মামী শুনে ছেলেকে রাগারাগি করে বললেন, রোকেয়া ঠিক কথা বলেছে। তুই সাথে না থাকলে ওরা যাবে কেমন করে? কোনো পুরুষ ছেলে সাথে না থাকলে মেয়েদের বাইরে বেরোনো উচিত না।

মানিক বলল, কেন? ছেলেরা যেতে পারলে মেয়েরা পারবে না কেন?

মনোয়ারা বলল, তোকে আর যেতে হবে না, আমরা যেতে পারব। তারপর তারা তিনজন রওয়ানা দিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর জুলেখা পিছন ফিরে মানিককে আসতে দেখে মনোয়ারাকে বলল, দেখ আপা, মানিক ভাই আসছে।

মনোয়ারা সেদিকে তাকাতে মানিকের চোখে চোখ পড়ে গেল।

মানিক দাঁড়িয়ে পড়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মনোয়ারা বলল, দাঁড়িয়ে আর কি করবি; চলে আয়। বিয়েবাড়ি বেড়ানোর লোভ সামলাতে যে পারিব না, তা আমি আগেই জানতাম।

মানিক এগিয়ে এসে বলল, আমি আসতাম না, ভাবলাম, পথে যদি কোনো দুষ্টু ছেলে তোমাদেরকে উত্যক্ত করে অথবা কাউকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়, তাই এলাম।

রোকেয়া বলল, থাক অত আর জ্যাঠামী করতে হবে না চল যাই।

বিয়ে বাড়িতে এসে রোকেয়ার সাথে একটি মেয়ের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মেয়েটির নাম আনোয়ারা। যে ক'দিন রোকেয়া সেখানে রইল, সে ক'দিন সব সময় আনোয়ারা তার সাথে থেকেছে। একদিন আনোয়ারা রোকেয়াকে বলল, তোমাকে আমার এত ভালো লেগেছে যে, কাছ ছাড়া করতেই মন চাচ্ছে না। তাই ভেবেছি তোমাকে ভাবি বানাব।

রোকেয়া হেসে উঠে বলল,-মানুষ ইচ্ছা করলেই কি সবকিছু করতে পারে? আল্লাহ পাকের মর্জি না হলে কিছুই হয় না।

আনোয়ারা বলল, তা অবশ্য ঠিক। তবু মানুষকে চেষ্টা করতে হয়। আজ তোমাকে আমার ভাইয়াকে দেখাব। দেখলে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হবে।

রোকেয়া আবার হেসে উঠে বলল, আর আমাকে যদি তোমার ভাইয়ার পছন্দ না হয়?

বারে, তুমি কি অপছন্দ করার মত মেয়ে নাকি?

সকলের পছন্দ তো এক রকম নয়। তাছাড়া সব থেকে বড় কথা হল ভাগ্য। আল্লাহ পাক যার যেখানে ভাগ্য লিখেছেন সেখানে হবে।

সেতো নিশ্চয়, কিন্তু আল্লাহ তো ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাকতে বলেন নি।

তা বলেন নি। তুমি এখন এসব কথা বাদ দাও।

কেন বাদ দেব শুনি?

কারণ আমার ইচ্ছা, অন্তত বি.এ. পাশ করব।

সেটা তো খুব ভালো কথা। ভাইয়া এম. এ. পাশ করে কলেজে প্রফেসারী করছে। বিয়ের পর ভাইয়া তোমাকে নিজের কলেজের ছাত্রী করে নেবে। এক সঙ্গে কলেজে খুব মজা করে যাবে আসবে।

রোকেয়া তার পিঠে একটা আদরের কিল মেরে বলল, তুমি তো দেখছি সবদিক দিয়ে পেকে গেছ।

আনোয়ারা বলল, তুমিওতো কম পাকনি।

কি করে?

কেউ নিজে না পাকলে অন্যের পাকামী ধরতে পারে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

এমন সময় মনোয়ারা এসে বলল, তোমরা এখানে গল্প করছ, আর আমি তোমাদেরকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। চল খাবে চল।

পরের দিন আনোয়ারা রোকেয়ার কাছে এলে তার মুখটা ভার দেখে রোকেয়া জিজ্ঞেস করল, তোমার মন খারাপ কেন?

আনোয়ারা বলল, গত রাতে আম্মাকে তোমার কথা বলে ভাবি বানাবার কথা বলেছিলাম। আম্মা শুনে বলল, তোর ভাইয়া নিজেই একটা মেয়ে পছন্দ করেছিল। তোর আব্বা মেয়ের বাবার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তাও ঠিক করে ফেলেছে। জান রোকেয়া, কথাটা শোনার পর আমার মন এত খারাপ হয়ে গেল যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

রোকেয়া বলল, এতে মন খারাপের কি আছে? বিয়ে সাদির ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। নসীবে যার যেখানে লেখা থাকবে সেখানে হবে। তুমি মন খারাপ করো না। নসীবে নেই বলে তোমার মনের বাসনা পূরণ হল না। তাই বলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে কেন? আমরা আমাদের বন্ধুত্ব আমরণ রাখার চেষ্টা করব।

আনোয়ারা বলল, তুমি ঠিক কথা বলেছ। তারপর ঠিকানা লিখে তার হাতে দিয়ে বলল, তোমারটাও লিখে দাও। চিঠির মাধ্যমে আমরা আমাদের বন্ধুত্ব আজীবন টিকিয়ে রাখব।

যার বিয়ে হচ্ছে তার নাম আজিজ। বিয়ের পরের দিন বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা একটা ঘরে ভিডিও দেখছিল। রোকেয়াও সেখানে ছিল। এক সময় তার কানে এল, কে যেন বলছে, আজিজ, ঐ মেয়েটি কে রে? আজিজ বলল, সম্পর্কে আমার ভাগনী।

রোকেয়ার পাশে তার মামাত বোন মনোয়ারা বসেছিল। সে কথাটা শুনতে পেয়ে তাকে বলল, আপা, তোমার কথা ঐ ছেলেটা জিজ্ঞেস করছে।

যেদিক থেকে কথাটা রোকেয়ার কানে এসেছে, সেদিক একবার চেয়ে নিয়ে মনোয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, ঐ ছেলেটা কে জানিস?

মনোয়ারা বলল, না আপা জানি না।

তাদের পাশে আনোয়ারাও ছিল। সেও ছেলেটার কথা শুনেছে। ওদের কথা শুনে বলল, ওতো আজিজ মামার বন্ধু হারুন।

রোকেয়া কাউকে কিছু না বলে উঠে চলে আসবার সময় হারুনকে আর একবার দেখতে গিয়ে তার চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জা পেয়ে রোকেয়া মাথা নিচু করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিয়ে বাড়িতে তিন দিন থেকে চার দিনের দিন রোকেয়া সবাইয়ের সাথে নানার বাড়ি ফিরে এল। তারপরের দিন জুলেখা ও রোকেয়া নিজেদের বাড়ি বদরপুর চলে এল।

দুই

বদরপুর গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্ব দিকে মুনসীরহাট গ্রাম। এই গ্রামের ছেলে হারুন। তার বাবার নাম বদরুদ্দিন। মায়ের নাম হানুফা বিবি। বদরুদ্দিন বছর পাঁচেক আগে এ্যাকসিডেন্ট করে অনেক দিন হাসপাতালে ছিলেন। মাথায় বেশি আঘাত পেয়েছিলেন। তাই সুস্থ হওয়ার পরও মাথায় গোলমাল থেকে যায়। কখনো ভালো থাকেন ! আবার কখনো পাগলের মত আচরণ করেন। ওঁদের শুধু সাত ছেলে। কোনো মেয়ে নেই। হারুন সবার বড়। সে ম্যাট্রিক পাশ করে দুবাইয়ে চাকরি কর। তার মেজ ও সেজ ভাই শামসু ও হোসেনকে সে দুবাইয়ে নিয়ে গিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। চার নাম্বার ভাই মজিদ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সংসার দেখাশুনা করে। তারপরের ভাইগুলো স্কুলে পড়ে। তাদের আর্থিক অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো। একতলা বেশ কয়েকটা পাকা রুম করেছে। জমি জায়গাও কিছু কিনেছে।

বদরপুর গ্রামে হাই স্কুল নেই। তাই এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা মুনসীরহাট জি এণ্ড আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে। রোকেয়া ঐ বিদ্যালয়ে ক্লাস টেনে পড়ে। তার বড় ভাই জাভেদ এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কাতারে চাকরি করছে। মেজ ভাই বখতিয়ারও এই স্কুলে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে চাঁদপুরে হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ছে। দু'ভাইয়ের পর রূপা, তারপর রোকেয়া। রোকেয়ার পর জুলেখা এবং সকলের ছোট বাহাদুর। জুলেখাও এই স্কুলের সেভেনের ছাত্রী। আর বাহাদুর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ক্লাশ ফোরে পড়ে।

বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর রোকেয়ার প্রায়ই হারুনের কথা মনে পড়ে, ছেলেটা দেখতে বেশ সুন্দর। ভাবে, আমার কথা আজিজ মামাকে কেন জিজ্ঞেস করল? আমার দিকেই বা অমন করে চেয়েছিল কেন? চোখে চোখ পড়ে যাওয়ার কথা হলে এখনো তাকে লজ্জা পায়।

একদিন রোকেয়া স্কুল ছুটির পর বান্ধবী লাকির সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। লাকি ও সে নিচের ক্লাস থেকে এক সঙ্গে পড়ে আসছে। রোকেয়া হঠাৎ দেখতে পেল,হারুন সামনে তেমাথা রাস্তার নীমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে রোকেয়া লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে চলে যেতে লাগল।

হারুন আস্তে করে বলল, শুনুন।

দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাকি খুব চালাক চতুর ও মুখরা মেয়ে। সে হারুনের দিকে চেয়ে বলল, রাস্তায় মেয়েদের একাকি পেলেই কথা বলতে ইচ্ছে করে বুঝি? আপনি আজিজ ভাইয়ের বন্ধু বলে কিছু বললাম না। নচেৎ মেয়েদের সঙ্গে এভাবে ডেকে কথা বলার মজা বুঝিয়ে দিতাম।

লাকির কথা শুনে হারুন লজ্জা পেয়ে কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, দেখুন, আপনারা আমাকে যা ভাবছেন, সে রকম ছেলে আমি নই। আপনি তো দেখছি আমাকে চেনেন। আমি কিন্তু আপনাকে না চিনলেও আপনার সঙ্গিনীকে চিনি। উনি আমার বন্ধু আজিজের ভাগ্নি।

লাকি বলল, তাতে কি হয়েছে? বন্ধুর ভাগনী হলেই পথে ঘাটে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে নাকি? আপনার বাড়ি কোথায়?

হারুন আরো বেশি লজ্জা পেয়ে বলল, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার বাড়ি এই মুনসীরহাটেই। আমি ওঁর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই।

লাকি রোকেয়াকে বলল, কিরে তুই ওঁকে চিনিস নাকি?

রোকেয়া হারুনকে দেখে মনে মনে পুলকিত হলেও বেশ লজ্জা পেয়েছিল। এখন তার কথা শুনে আরো বেশি লজ্জা পেয়ে কথা বলতে পারল না। নিজের অজান্তে শুধু হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ল।

লাকি অবাক হয়ে একটু চিন্তা করে হারুনকে বলল, ওর সাথে কি কথা বলবেন বলছিলেন, তাড়াতাড়ি বলুন।

হারুন বলল, কথা এমন কিছু নয়, আমি আপনাদের নাম জানতে চাই।

লাকি বলল, নাম জেনে কি করবেন? তবু বলছি, আমার নাম লাকি। আর ও যখন আপনার বন্ধুর ভাগনী তখন নাম নিশ্চয়ই জানেন?

হারুন বলল না। তাকে জিজ্ঞেস করিনি।

লাকি বলল, ওর নাম রোকেয়া। এবার আসি তাহলে?

হারুন আসুন বলে একবারে রোকেয়ার দিকে তাকিয়ে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

হারুনকে চলে যেতে দেখে তারাও নিজেদের পথে হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে লাকি রোকেয়াকে জিজ্ঞেস করল, ওকে চিনলি কি করে? কোনো দিনতো তুই ওর কথা আমাকে বলিস নি?

রোকেয়া আজিজ মামার বিয়েতে গিয়ে যা হয়েছিল, তা বলে বলল, তারপর এই আজ দেখা। ওর কথা কি আর তোকে বলব?

লাকি বলল, কিন্তু তোদের দু'জনের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, তোরা প্রেমে পড়েছিস।

রোকেয়া একটু রেগে গিয়ে বলল, কি বাজে বকছিস?

মনে হচ্ছে আমার কথায় রেগে গেছিস? তারপর হেসে ফেলে বলল, প্রেমে পড়লে প্রথম প্রথম সে কথা কেউ বললে সবাই রেগে যায়।

তুই জানলি কি করে? তুইও তাহলে কারো প্রেমে পড়েছিস?

পড়লে তো তুই জানতে পারতিস। প্রেমের পথে আমি কোনোদিন পা বাড়াব না।

কেন?

প্রেম নাকি মানুষকে সব সময় কাঁদায়।

ধেৎ বাজে কথা। প্রেম মানে আনন্দ। সেখানে কান্না থাকবে কেন?

লাকি বলল, আমার চাচাতো ভাই তার মামাতো বোনের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। এখন তাদের এমন একটা দিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়নি। দু'জনেই এখন অনুতপ্ত। বলে প্রেম করে বিয়ে না করে মা-বাবার পছন্দমত বিয়ে করলে, এমন অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হত না। তুই উপন্যাস পড়িস কিনা জানি না, আমি কিন্তু পড়ি। ভাইয়া ভাবিকে পড়ার জন্য এনে দেয়। আমি চুরি করে পড়ি। তাতেও দেখি যারা প্রেম করে বিয়ে করে, সাংসারিক জীবনে তারা সুখ শান্তি পায় না। তবে সবক্ষেত্রে যে এ রকম হয়, তা নয়। খুব কম প্রেমিক প্রেমিকা দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি পায়।

রোকেয়া বলল, তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমিও কিছু কিছু ভালো উপন্যাস পড়ি। কই সে সবেতো খারাপ কিছু পাইনি। প্রেম করে বিয়ে করলে সংসার সুখেরই হয়। আমার মামা মামীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। মামা-মামীর মধ্যে আমি কোনোদিন ঝগড়া তো দূরের কথা, একটু কথা কাটাকাটি হতেও দেখিনি।

লাকি বলল, তোর বুদ্ধি একদম কাঁচা। কি করে যে তুই পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো করিস ভেবে পায়নি। আরে বোকা, পছন্দ করা আর প্রেম করা এক জিনিস হল বুঝি?

রোকেয়া বলল, বাদ দে ওসব কথা। তোর সঙ্গে তর্কে পারব না।

লাকি বলল, তুই ঐ ছেলেটার নাম জানিস?

হারুন।

তুই তো দেখছি তার নাম ও জানিস। সে তোর নাম জানল না, এ কেমন কথা। তার নাম জানলি কি করে?

ঐ দিন আনোয়ারা নামে সেখানকার একটা মেয়ে বলেছিল।

আমার মনে হয় হারুন তোকে পছন্দ করেছে।

তাতে আমার কি?

তাকে তোর পছন্দ হয়নি? ছেলেটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর।

পছন্দ হলেই বা কি? সে কথা কি মা-বাবাকে বলতে পারব? তোর মনে ধরেছে মনে হচ্ছে। পছন্দ হলে বল, আমি তোর ভাবিকে বলে বিয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করি।

হঠাৎ তোর মনে এরকম হল কেন?

হারুন দেখতে সুন্দর বললি, তাতেই মনে হল।

সুন্দরকে সুন্দর বললে মনে ধরা হয় বুঝি? সুন্দরকে তো সবাই পছন্দ করে। তাছাড়া আমার পছন্দ হলে তো আর হবে না। তারও আমাকে পছন্দ হতে হবে। সে তো তোকে পছন্দ করেছে।

এটা তোর মনগড়া কথা। অতক্ষণ ধরে যা কিছু কথা বলেছে, তা তোর সঙ্গে। আমার সঙ্গে একটাও বলেনি।

তা বলেছে, তবে তোকে উপলক্ষ্য করে। তাই তো আমার সঙ্গে কথা বলার সময় বারবার তোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

রোকেয়া বলল, কি জানি হয়তো তোর কথা ঠিক। ততক্ষণে তারা রোকেয়াদের বাড়ির কাছে চলে এসেছে।

লাকি বলল, আজ চলি। ভেবেচিন্তে বলিস, চেষ্টা করব।

আমার ভাববারও কিছু নেই আর বলারও কিছু নেই। তুই বরং নিজের কথা ভাবিস, এই কথা বলে রোকেয়া বাড়ির দিকে চলে গেল।

লাকির বড় আপার বিয়ে হয়েছে মুনসীরহাটে। তার দেবর নাসিমের সঙ্গে হারুনের খুব জানাশোনা। সে যখন জানতে পারল হারুন রোকেয়াকে পছন্দ করে তখন তাকে বলল, রোকেয়া আমার ভাবির বোনের বান্ধবী। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

হারুন শুনে খুশি হয়ে বলল, তাই কর।

একদিন নাসিম হারুনকে সঙ্গে করে লাকিদের বাড়ি বেড়াতে এল। সে সময় নাসিমের ভাবি বাপের বাড়িতে ছিল। নাস্তা খাওয়ার সময় নাসিম ভাবিকে হারুনের কথা বলল।

শুনে নাসিমের ভাবি অর্থাৎ লাকির বড় বোন জাহেদা বলল, তাই নাকি?

নাসিম বলল, হ্যাঁ ভাবি তাই। তুমি আমার বন্ধুর এটুকু উপকার কর।

জাহেদা হেসে উঠে বলল, রোকেয়া লাকির বান্ধবী। ছোট বোনের বান্ধবীকে তো আমি কিছু বলতে পারব না। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, আমার ভাবিকে দিয়ে ম্যানেজ করছি।

নামিস বলল, যা করলে ভালো হয় তাই কর।

ওদের নাস্তা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর জাহেদা তার ভাবিকে নাসিম ও হারুনের আসার উদ্দেশের কথা বলে ব্যবস্থা করতে বলল।

জাহেদার ভাবি মুচকি হেসে বলল, এটা আর তেমন কঠিন কাজ নাকি? রোকেয়ার সঙ্গে আমার খুব ভাব। ডাকলেই ছুটে আসবে। আমি এক্ষুণি সে ব্যবস্থা করছি। এই কথা বলে সে লাকির কাছে গিয়ে বলল, তুমি রোকেয়াকে ডেকে নিয়ে এস। হারুন ভাই এসেছে, তাকে বলবে না।

লাকি হারুনকে দেখেই ব্যাপারটা অনুমান করেছিল। এখন ভাবির কথা শুনে অনুমানটা দৃঢ় হল। বলল, তুমি যাও, আমি একটু পরে ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।

ভাবি বলল, তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এস। ওরা বেশিক্ষণ থাকবে না। কথা শেষ কর চলে গেল।

লাকি রোকেয়াদের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলল, তোকে ভাবি ডাকছে।

লাকির ভাবির সঙ্গে রোকেয়ার খুব ভাব। লাকির কাছে যখন যায় তখন তার সঙ্গে প্রায়ই গল্প করে। সেও মাঝে মাঝে গল্প করার জন্য রোকেয়াকে ডেকে পাঠায়। লাকির কথা শুনে বলল, এখন যাব না। বিকেলে যাব। মনটা ভালো নেই। আয় বস, দু'জনে গল্প করি।

লাকি বলল, তোর মনে আবার কি হল?

রোকেয়া বলল, কি যে হয়েছে, ছাইপাস কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন বস না, দুটো কথা বলি।

এখন বসতে পারব না। ভাবি তোকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে যেতে বলেছে।

চল তাহলে, তোদের বাড়িতেই সবাই মিলে গল্প করা যাবে।

লাকি বলল, হ্যাঁ তাই চল।

রোকেয়া লাকির সঙ্গে তদের বাড়িতে এলে লাকি বলল, তুই ভাবির ঘরে যা, আমি একটু পরে আসছি।

রোকেয়া ভাবির ঘরে এসে বলল, কি খবর ভাবি, হঠাৎ জরুরী তলব কেন?

ভাবি বলল, বস। এমনি গল্প করার জন্য ডাকলাম।

তারা গল্প করতে লাগল।

নাসিম ও হারুন অন্য ঘরে কথা বলছিল। লাকি বাইরে থেকে নাসিমকে আস্তে আস্তে কিছু কথা বলে ভাবির ঘরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

লাকি আসার দু'তিন মিনিট পর দু'জন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে রোকেয়া সালাম দেওয়ার সময় নাসিমের সঙ্গে হারুনকে দেখে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল। সে নাসিমকে চিনে। লাকিই একদিন তার বড় বোনের দেবরের সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

নাসিম সালামের উত্তর দিয়ে দু'জন দুটো চেয়ারে বসল। তারপর নাসিম রোকেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি লেখাপড়া করছেন, অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমার বন্ধু হারুন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

রোকেয়া এদের সামনে এই কথা বলায় আরো বেশি লজ্জা চুপ করে রইল।

তাই দেখে নাসিম বলল, ঠিক আছে আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তা হলে বাইরে চলে যাচ্ছি। তারপর ভাবিকে ও লাকিকে ইশারা করে বেরিয়ে আসতে বলে চলে গেল। সেই সাথে ভাবি ও লাকি চলে গেল।

তারা চলে যাওয়ার পরও কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। হারুনও লাজুক ধরনের ছেলে। এক সময় সঞ্চয় করে বলল, রোকেয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি। চুপ করে থেক না, কিছু বল।

হারুনের কথা শুনে রোকেয়া যেমন ভীষণ লজ্জা পেল তেমনি মনের মধ্যে একটা ভয় মিশ্রিত আনন্দের শিহরণ অনুভব করল। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারল না।

হারুন আবার বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। সে জন্যে তোমার মা-বাবাকে জানাবার আগে তোমার মতামত জানতে এসেছি। বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ে উভয়ে উভয়ের মতামত জেনে নেয়া ভালো। তাহলে বিয়ের পর কোনো অসন্তোষ দেখা দেয় না। আর ইসলামেও বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের মত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

রোকেয়া খুব লজ্জাশীলা মেয়ে। হারুনের কথার উত্তরে কি বলবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করেই রইল।

রোকেয়া কোনো কথা বলছে না দেখে হারুন ভাবল, সে হয়তো তাকে পছন্দ করে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। এবার কিছু বল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও যখন রোকেয়ার কাছ থেকে উত্তর পেল না তখন হারুন বলল, আমার ভাবা কি অন্যায় হবে, তুমি আমাকে পছন্দ কর না? কথা শেষ করে সে চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

রোকেয়ার এতক্ষণে লজ্জা কেটে গেছে। বলল, দেখুন, এ ব্যাপারে আব্বা আম্মা যা করবেন তাই হবে। আপনি আমার উপর মনে কষ্ট নেবেন না। তারপর নাসিমকে আসতে দেখে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে পাশের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

তাই দেখে নাসিম হারুনকে বলল, রোকেয়া খুব লাজুক মেয়ে। তোর সঙ্গে কথা বলেছে?

হারুন বলল, তোর কথাই ঠিক। ও খুব লাজুক। কথা বলতেই চায় না। তবে শেষমেষ যতটুকু বলেছে তাতেই যা জানার জানা হয়ে গেছে।

নাসিম ও হারুন বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর লাকি ও তার ভাবি রোকেয়া যে রুমে ছিল, তার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, রোকেয়া দরজা খোল।

রোকেয়া দরজা খুলে লাকির পিঠে কয়েকটা কিল মেরে বলল, তুই সবকিছু জেনেও আমাকে আগে বলিসনি কেন? আব্বা-আম্মা শুনলে আস্ত রাখবে না। আর পাড়া-পড়শী শুনলে কত বদনাম করবে ভেবে দেখেছিস?

লাকি কিছু বলার আগে তার ভাবি বলল, ওর কোনো দোষ নেই। আমি জানাতে নিষেধ করেছিলাম। তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা একথা কাউকে জানাব না।

রোকেয়া যখন তাদের কাছ থেকে ফিরে আসছিল তখন লাকি তার সাথে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, কিরে, হারুন ভাই কি কথা বললেন?

রোকেয়া কপট রাগ দেখিয়ে বলল, বলব না। তুই ওঁর কথা আগে বললি না কেন?

লাকি বলল, বললে তো তুই আসতিস না। তাছাড়া ভাবিতো বলল, সে নিষেধ করেছিল। তোর মনের মানুষের সঙ্গে দেখা করলাম, আর তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস? এই জন্যেই লোকে বলে, "যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।"

রোকেয়া হেসে উঠে বলল, তোকে আর দোষ দেব না। তারপর হারুন ও সে যেসব কথা বলেছিল তা বলল।

লাকি বলল, আমার মন বলছে, হারুন ভাইয়ের সাথেই তোর বিয়ে হবে।

তোর মন বললে তো হবে না, আল্লাহ পাকের মর্জি থাকলে হবে।

তাতো বটেই। দো'য়া করি আল্লাহ পাকের যেন মর্জি হয়।

রোকেয়া হেসে উঠে বলল, আমার তো মনে হচ্ছে আমার চেয়ে তুই বিয়ে করার জন্য লালায়িত হয়ে পড়েছিস।

এ কথা কেন তোর মনে হল?

আমার বিয়ের জন্য তোর আগ্রহ দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিয়ের পর আমার দেবরের জন্য তোকেও যেন তাড়াতাড়ি নিয়ে যাই।

লাকি হেসে উঠে বলল, তা তুই বলতে পারিস। তবে আমি সে কথা ভেবে বলিনি। হারুন ভাই তোকে ভালবাসেন। আর তুইও তাকে পছন্দ করিস। তাই তোদেরকে সুখী দেখার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছি।

রোকেয়া আর কিছু না বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তিন

হারুন চার মাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। এখন তার বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্ধু আজিজের বিয়েতে গিয়ে রোকেয়াকে দেখে সিদ্ধান্ত নিল তাকে বিয়ে করবে। সে কথা একদিন আজিজকে বলে বলল, আম্মাকে তোর ভাগনীর কথা সরাসরি বললে রাজি হবে না। তাই ভেবেছি, তোকে দিয়ে–

তাকে থামিয়ে দিয়ে আজিজ বলল, কেন?

হারুন বলল, আম্মা একটা মেয়ে দেখে রেখেছে। আমি তাকে দেখেছি। সে মেয়েকে আমার একদম পছন্দ হয়নি। এখন তোকে যা বলছি শোন, তারপর যা বলার বলে বলল, কিরে যা বললাম পারবি না?

আজিজ হেসে উঠে বলল, নিশ্চয় পারব, এটা আর তেমন কঠিন কাজ নাকি?

কয়েকদিন পর একদিন আজিজ মুনসীরহাটে হারুনদের বাড়িতে এল। হারুনের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে, আজ এই সময়ে সে ঘরে থাকবে না। আজিজ হারুনের সাথে অনেকবার তাদের বাড়িতে এসেছে। সবাই তাকে চিনে। সে সরাসরি বাড়ির ভিতরে ঢুকে হারুনের নাম ধরে ডাকল।

হারুনের মা হানুফা বিবি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিলেন। আজিজকে দেখে বললেন, সে তো ঘরে নেই বাবা, কিছুক্ষণ আগে কোথায় যেন গেল। তারপর ঝাড়ুটা উঠোনের একপাশে রেখে বললেন, এস বাবা বস। ও হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে।

আজিজ ওঁর সাথে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে বসে বলল, চাচি আম্মা আপনিও বসুন।

হানুফা বিবি বললেন, তুমি বস, আমি তোমার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি।

আজিজ বলল, বাইরে থেকে এক্ষুনি চা খেয়ে এলাম, এখন আর খাব না। হারুন আসুক, তখন না হয় একসাথে খাব। আপনি বসুন, দু'একটা কথা বলব।

হানুফা বিবি বসে বললেন, ঠিক আছে, কি বলবে বল।

আজিজ বলল, এত বড় সংসারের কাজ আপনি একা আর কতদিন করবেন? এবার হারুনের বিয়ে দিন। বৌ এলে তবু আপনি একটু আরাম পাবেন। তাছাড়া আপনাদের ঘরে কোনো মেয়ে নেই। হারুনের বিয়ে দিলে তবু একটা মেয়ে আসবে।

হানুফা বিবি বললেন, আমি তো তাই চেয়েছিলাম। সে জন্যে একটা মেয়েও দেখেছিলাম। কিন্তু হারুন সেই মেয়েকে বিয়ে করবে না।

আজিজ বলল, সেই মেয়েকে হয়তো হারুনের পছন্দ হয়নি, তাই করতে চায়নি। আপনি আরো অন্য মেয়ে দেখুন। তাদের মধ্যে কাউকে না কাউকে তার পছন্দ হবে। আর যদি বলেন, আমিও মেয়ের সন্ধান করি। সে তো অনেকদিন থেকে বিদেশ করছে। তার বিয়ের বয়সও হয়েছে।

হানুফা বিবি বললেন, তাই দেখব। তুমিও ভালো মেয়ের খোঁজ কর। তারপর আবার বললেন, হারুন তো এখনো এল না। চা করে দিই, খেয়ে আজ তুমি যাও। পরে আবার এস। বেলা হয়ে যাচ্ছে। রান্না চাপাতে হবে।

আজিজ চা খেয়ে ফিরে আসার সময় পথে হারুনকে দেখতে পেয়ে সব কথা বলল।

হারুন মুচকি হেসে বলল, ঠিক আছে, আবার কবে আসবি?

আজিজ বলল, দু'চার দিন যাক, তারপর আসব।

তাই আসিস বলে হারুন সালাম বিনিময় করে ঘরের দিকে চলল।

দু'চারদিন পর আজিজ হারুনদের বাসায় এল। আজও আসবার আগে হারুনের সাথে পরামর্শ করে এসেছে। তার মাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন চাচি আম্মা?

হানুফা বিবি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আমার আর থাকা না থাকা একই কথা। সংসারে খেটে খেটে জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

আজিজ বলল, সেই জন্যেই হারুনের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া উচিত।

হানুফা বিবি বললেন, সে কথা তোমরা ভাবলেও হারুন ভাবেনি। তা না হলে কত মেয়ে তাকে দেখালাম, একটাকেও তার পছন্দ হল না কেন?

আজিজ হারুনের চালাকির কথা বুঝতে পেরে মনে মনে হাসল। মুখে রাগ দেখিয়ে বলল, তাই নাকি? দেখা হোক একবার, যা বলার বলব। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে

বলল, আমি একটা মেয়ে দেখেছি। আপনারা হারুনকে সাথে নিয়ে দেখুন। আমার মনে হয়, হারুনের অপছন্দ হবে না।

আজ হারুনের বাবা ঘরে ছিলেন। হারুনের বিয়ের কথা শুনে বেরিয়ে এসে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজিজ ঠিক কথা বলেছে। তোমরা সবাই গিয়ে ঐ মেয়ে দেখে এস। পছন্দ হলে এবারেই হারুনের বিয়ে দিয়ে দেব। আবার কবে আসবে না আসবে তার কোনো ঠিক আছে? তারপর আজিজকে বললেন, আমরা কয়েকদিনের মধ্যে মেয়ে দেখতে যাব। যাবার আগে হারুনকে দিয়ে তোমাকে খবর দেব। তুমি মেয়ের বাবাকে সে কথা বলে রেখ।

আজিজ বলল, ঠিক আছে চাচা তাই হবে। তারপর সালাম বিনিময় করে বেরিয়ে এল। আজও হারুন আজিজের জন্য পথে অপেক্ষা করছিল। তাকে ফিরে আসতে দেখে বলল, কি খবর বল।

আজিজ তার বাবার কথা বলে বিদায় নিয়ে রোকেয়াদের বাড়িতে গেল।

শাহেদ আলী বাড়িতেই ছিলেন। সালাম বিনিময় করে বললেন, কি খবর বড় কুটুম? হঠাৎ কি মনে করে? শশুর বাড়ি যেতে যেতে পথ ভুলে বোনের বাড়ি ঢুকে পড়েছ মনে হচ্ছে?

আজিজ হেসে উঠে বলল, দুলাভাই কি যে বলেন? পথ ভুল হবে কেন? আসলে আপনাদের বাড়িতেই এসেছি।

শাহেদ আলী বললেন, তাহলে আগমনের হেতুটা বলে ফেল।

আজিজ হারুনের পরিচয় দিয়ে রোকেয়ার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিল।

শাহেদ আলী রাজি হলেন না। বললেন, কয়েক মাস পরে ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, এখন বিয়ে হলে তা আর হবে না। তারা যদি অপেক্ষা করতে পারে। তাহলে তখন দেখা যাবে।

আজিজ বলল, কিন্তু তারা তো এতদিন অপেক্ষা করবেন না। তাছাড়া ছেলে চার মাসের ছুটিতে এসেছে। আবার কবে ফিরবে তার কোনো ঠিক নেই। এবারেই ছেলের বিয়ে দিতে চান।

শাহেদ আলী বললেন, তাহলে তাদেরকে অন্য মেয়ে দেখতে বল।

আজিজ দুলাভাইকে রাজি করাতে না পেরে নাস্তা খেয়ে রোকেয়ার নানা নানিকে গিয়ে ধরল।

আজিজ রোকেয়ার নানির চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। ওঁরা তার কথা ঠেলতে পারলেন না। বললেন, তুমি এখন যাও। আমরা জামাইকে ডেকে রাজি করাবার চেষ্টা করব।

জয়নুদ্দিন একদিন জামাইকে ডেকে পাঠিয়ে আজিজের প্রস্তাবের কথা বলে বললেন, আমার মনে হয়, ওখানে রোকেয়ার বিয়ে হলে সুখী হবে।

সেখানে রোকেয়ার নানি রহিমন বিবি ছিলেন। তিনিও জামাইকে বললেন, এই কাজ করলে রোকেয়া সুখী হবে।

শাহেদ আলী শ্বশুর-শাশুড়ির কথা ফেলতে পারলেন না। বললেন, আপনারা যখন এই কাজ ভালো হবে বলছেন তখন আর আমি অমত করব না।

কয়েকদিন পর আজিজ এসে ওঁদের মুখে শাহেদ আলী রাজি হয়েছে শুনে একটা দিন ঠিক করে উভয় বাড়িতে খবর দিয়ে মেয়ে দেখার কথা জানাল।

আজ রোকেয়াকে দেখার জন্য লোক আসবে। তাই রোকেয়ার মা-বাবা মেহমানদের খানাপিনা তৈরির কাজে ব্যস্ত।

বেলা দশটার সময় হারুন ও তার দু'ভাই, তার মা, তিনজন চাচি, দুটো চাচাতো বোন, দূর সম্পর্কের এক ভাবি, হারুনের নানা, মোট এগার জন রোকেয়াকে দেখতে এল। হারুন প্রথমে আসতে রাজি ছিল না। শেষে আজিজ যখন তাকে বলল, তুই না গেলে তোর মা সন্দেহ করবে তখন না এসে পারেনি।

নাস্তা ও খাওয়া দাওয়ার পর রোকেয়াকে দেখে সকলের পছন্দ হল। শুধু হারুনের মা হানুফা বিবির ও তার এক জায়ের পছন্দ হল না। কিন্তু সকলের পছন্দ হয়েছে জেনে তারা সেখানে কিছু প্রকাশ করলেন না।

হারুনের নানা আনসার উদ্দিনের সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে। তিনি খুব রসিক লোক। বললেন, রোকেয়ার দীর্ঘ চুল ও ডান চোখের কোনের পাশে যে তিলটা রয়েছে, তাতে করে তাকে খুব সুন্দর লাগছে। তারপর রোকেয়ার হাতে আংটি পরাবার সময় বললেন, এই মেয়েকে দেখিয়ে অন্য মেয়েকে দিলে ঐ দুটো জিনিস দেখে আমরা আসল নকল ধরে ফেলব। তারপর বিয়ের পাকা কথাবার্তা ও দিনক্ষণ ঠিক করে তারা বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়িতে এসে হানুফা বিবি বললেন, মেয়ে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। সেই সাথে তার ঐ জাও বলে উঠলেন, আমারও পছন্দ হয়নি।

হারুনের নানা তাদের কথা শুনে বললেন, যখন সবাই পছন্দ করে কথাবার্তা পাকা হল তখন তোমরা কিছু বললে না, এখন আবার এরকম কথা বলছ কেন? তারপর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ হানুফা, তুই যদি এই মেয়েকে বৌ করে না আনিস, তাহলে আমি আর হারুনের বিয়েতে তো আসবই না, এমনকি সারাজীবনেও তোদের বাড়িতে আসব না। এরপর হারুনকে বললেন, তুমি যদি রোকেয়াকে বিয়ে না কর, তবে আমিই করে ফেলব।

এই কথা শুনে হারুন হাসি চাপাতে না পেরে সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় মনে মনে বলল, আল্লাহ পাক, তুমি এই বিয়ে কবুল কর।

পরের দিন হানুফা বিবি রোকেয়াদের বাড়ি পান-চিনি পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পর শাহেদ আলী খবর পেলেন, পাত্র পক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দেবেন। খবর পেয়ে তিনি খুব মুষড়ে পড়লেন। চিন্তা করলেন, বড় মেয়ে রূপারও একবার বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। আবার মেজ মেয়ের বেলায়ও তাই হবে নাকি? আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করল, "ইয়া আল্লাহ্, তুমি রাহমানুর রাহিম! তুমি আমাদের উপর রহম কর। আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর। যা শুনেছি তা যেন মিথ্যে হয়। আমার মান ইজ্জত ধূলোয় মিশিয়ে দিও না।"

দু'একদিন পরে শাহেদ আলী জানতে পারল, বাড়ির মধ্যে শুধু হারুনের মা বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছেন।

এদিকে মা বিয়ে ভেঙ্গে দেবে শুনে হারুন অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর সে মাকে বলল, পাকা কথা হয়ে যাওয়ার পর বিয়ে ভেঙ্গে দিলে গ্রামের লোকজন আমাদের গায়ে থুথু ছিটাবে। তখন আমাদের মান সম্মান থাকবে কোথায়? আমরা কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তাছাড়া নানাজী যেখানে মাথা হয়ে সবকিছু করলেন,

সেখানে তুমি যদি বিয়ে ভেঙ্গে দাও, তাহলে তারও মান সম্মান থাকবে না। মুরব্বী মানুষের মান সম্মান তুমি মেয়ে হয়ে নষ্ট করবে? তার চেয়ে এক কাজ কর, বিয়ের কাজ হয়ে যাক। এখন যদি তুমি বৌ আনতে না চাও, তাহলে আমি এখন বিদেশ চলে যাই। আবার যখন আসব তখন না হয় বৌ আনবে।

হানুফা বিবি বললেন, আমি কারো তোয়াক্কা করি না। ঐ মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব না। ওর বাপ গরিব। মেয়ে জামাইকে কিছু দিতে পারবে না। আমি তোর বিয়ে বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে দেব।

হারুন মায়ের উপর রেগে গিয়ে বলল, তুমি গরিবদের এত ঘৃণা কর তা জানতাম না। আমরাও তো গরিব ছিলাম। আজ না হয় তিন ভাই বিদেশে চাকরি করে আল্লাহ পাকের রহমতে কিছু উন্নতি করেছি। তবু বড়লোক তো হতে পারিনি। আর বিদেশ কি আমাদের নানার বাড়ি যে, সেখানে চিরকাল থাকব? মেয়ের বাবার না হয় আমাদের চেয়ে অবস্থা একটু খারাপ। তাই বলে মেয়েটা কি দোষ করল? কেন তুমি তার ফুলের মত জীবনটা নষ্ট করতে চাইছ? আমারো শেষ কথা শুনে রাখ, তুমি যদি এই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে না দাও, তাহলে সারাজীবন আমি আর বিয়ে করব না এবং বিদেশ থেকে দেশেও ফিরব না।

হানুফা বিবি যেমন মুখরা তেমনি হিংসুটে ও লোভী। তিনটে ছেলে বিদেশে থাকে। মোটা অংকের টাকা পাঠায়। তাই দেমাগে যেন মাটিতে পা পড়ে না। গরিবদের মোটেই দেখতে পারেন না। ছেলেদের বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে অনেক সোনা-দানা, টাকা-পয়সা এবং ঘরের আসবাবপত্র পাবেন, সেই রকম আশা পোষণ করেন। আসলে কিন্তু রোকেয়ার বাবার চেয়ে নিজেরা যে বেশি বড়লোক নয়, সে কথা ভেবে দেখেন নি। উভয়ের আর্থিক অবস্থা প্রায়ই একরকম। তিনটে ছেলে রোজগারী বলে নিজেদেরকে খুব বড়লোক ভাবেন। তাই রোকেয়াকে বৌ করতে চান না। কিন্তু হারুনের কথা শুনে শেষমেষ মনের ক্ষোভ মনে চেপে রেখে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

মাস খানেকের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়ে গেল। বর ও বরযাত্রীরা রাত তিনটের সময় গাড়ি করে বৌ নিয়ে ফিরল। কিন্তু বৌকে কেউ ঘরে তুলল না। গেটের কাছে প্রায় তিন ঘন্টা বৌ গাড়িতে বসে রইল।

বাড়ির ভিতর এতক্ষণ ধরে হানুফা বিবি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে চলেছেন। বৌয়ের মা-বাবারা যে সব জিনিসপত্র দিয়েছেন, তা যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি নিম্নমানের। আত্মীয়-স্বজনেরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন বৌকে ঘরে তুলল তখন সকাল ছটা।

বৌকে তোলার পর হানুফা বিবির সেই জা তার সাথে তাল মিলিয়ে বলতে লাগলেন, এটা দেয়নি, ওটা দেয়নি। আমার মা-বাবারা এমন কোনো জিনিস দিতে বাকি রাখেনি, যা দেখে কেউ একটু মুখ খুলতে পারেনি।

হানুফা বিবি বললেন, আমি জানতাম ওরা গরিব। কোথা থেকে অত কিছু দেবে? এমন ছোটোলোকের ঘরের মেয়েকে আমি বৌ করতে চাইনি। এমন অলক্ষী মেয়েকে নিয়ে আমি চলতে পারব না। সেই জন্যে আমি প্রথম থেকেই অমত করেছি। ঐ মেয়েকে আমার পছন্দও হয়নি, আর কোনোকালে হবেও না।

রোকেয়ার সঙ্গে তার নানি রহিমন বিবি এসেছেণ। তিনি এদের কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে চিন্তা করতে লাগলেন, এ কেমন ব্যাপার? বৌ আনতে না আনতে এসব কি

হচ্ছে? এরা তো দেখছি খুব নিচু মনের মানুষ। রোকেয়া খুব ছোটলোকের বাড়িতে পড়ল। জীবনে কোনোদিন এতটুকু সুখ শান্তি পাবে না। তখন ভাইপো আজিজের উপর খুব রাগ হল। আবার ভাবলেন, আজিজেরই আর দোষ কি? সে এদের মনের কথা জানবে কি করে? তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। রোকেয়ার শাশুড়ীকে বললেন, তোমরা কেমন মানুষ গো, নাতনির সাথে রাত তিনটে থেকে গাড়িতে বসিয়ে রাখলে, তারপর যদিও বা ঘরে নিয়ে এলে, এতক্ষণ পর্যন্ত একটা পানও দিলে না?

হানুফা বিবি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, কে তুমি? তোমাকে কে চিনে? আমি যা ইচ্ছা তাই করব, তুমি নাক গলাবার কে?

রহিমন বিবি বললেন, বাবারে বাবা, শুনেছিলাম, রোকেয়ার শাশুড়ী একদম সোজা মানুষ। এমন কি কেউ কোনোদিন তার গলা পর্যন্ত শুনেনি। এখন দেখছি তার উল্টো। রোকেয়া শাশুড়ীর সঙ্গে চলবে কি করে? এই ঘরে দিন গুজরান করবে কি করে?

হানুফা বিবির এক বোন ভাগনার বিয়েতে এসেছেন। তিনি সেখানে ছিলেন। বলে উঠলেন, উনি কি বৌয়ের নানি? না বৌয়ের সাথে বাঁদী হয়ে এসেছে?

রহিমন বিবি মনে খুব আঘাত পেলেন। ভাবলেন, এরা শুধু ছোট লোক নয়, খুব নিচু শ্রেণীর ছোটলোক। এদেরকে একটা কথা বললে সাতটা শুনিয়ে দেয়। তাই তিনি আর কোনো কথা না বলে চুপ করে গেলেন।

রোকেয়া ঘোমটা দিয়ে বসে বসে সবকিছু শুনছে আর চোখের পানি ফেলছে। এভাবে সারাদিন কেটে গেল। অবশ্য এক টাইম নাস্তা এবং দু'টাইম ভাত তারা খাইয়েছে। রহিমন বিবির এখানে কিছু মুখে দিবার ইচ্ছা ছিল না। সে না খেলে রোকেয়াও খাবে না জেনে অল্প কিছু খেয়েছেন। আর রোকেয়ার কেঁদে কেঁদে পেট ফুলে গেছে। সে আর কি খাবে। তবু নানির জেদাজেদীতে দু'চার গাল খেয়েছে।

রাতে রোকেয়াকে বাসর ঘরে নেওয়া হল। সাথে হারুনের দু'জন চাচাতো ভাবি ছিল। তারা অনেক ঠাট্টা মস্করা করে এক সময় চলে গেল। রোকেয়ার একা একা বেশ ভয় করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর হারুন এসে তার পাশে বসে রোকেয়ার একটা হাত ধরে বলল, রোকা, তুমি খুব ভয় পেয়েছ না? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কত সাধনার পর তোমাকে পেয়েছি। যেই যা তোমাকে বলুক না কেন, তুমি কিছু মনে করবে না। আমি ঠিক থাকলে আল্লাহর রহমতে কেউ কিছু করতে পারবে না। তারপর তার ঘোমটা খুলে দিয়ে বলল, তোমাকে দেখার জন্য কতদিন রাস্তার ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করেছি, কখন তুমি স্কুলে যাবে এবং আসবে। আমাকে খারাপ ছেলে ভাবতে পার ভেবে, ঐ একদিন ছাড়া আর কোনোদিন তোমার সামনে যাইনি। আজ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় প্রাণ ভরে দেখব। কই মুখ তুলে আমার দিকে তাকাও তো।

স্বামীর কথা শুনে রোকেয়ার ভয় কেটে গেলেও লজ্জায় মাথা নিচু করেই রইল।

রোকেয়াকে ঐ অবস্থায় থাকতে দেখে হারুন বলল, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? না হলে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

রোকেয়া আর চুপকরে থাকতে পারল না। মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে বলল, এমন কথা বলবেন না। আপনাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তারপর স্বামীর দু'পায়ে হাত ছুঁয়ে সালাম করে বলল, সেই আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাকে আপনার মোবারক কদমের সেবা করার সুযোগ দিলেন।

হারুন তাকে দু'হাত জড়িয়ে ধরে তার দু'গাল চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে বলল, সত্যি রোকা, তোমাকে পেয়ে আমিও ধণ্য হলাম। সে জন্যে আমিও আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

হারুন জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে রোকেয়াও তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সে থেমে যেতে বলল, আমি কি আপনার ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারব?

হারুন তাকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে বলল, কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। আমাদের উপর সংসারের ব্যাপারে যত বড় তুফান বয়ে যাক না কেন, আমরা দু'জন দু'জনকে ভালবেসে সেসব সহ্য করে যাব। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি মন দিয়ে শোন। যদি তুমি আমার কথাগুলো মনে রেখে সেই মত চল, তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের জীবনে কোনো অশান্তি প্রবেশ করতে পারবে না। জানতো সব মানুষ সমান হয় না। আল্লাহ মাফ করুক, আমি আমার আম্মার বদনাম করছি না, তোমাকে বোঝাবার জন্য বলছি। তুমি বোধহয় শুনেছ, তোমাকে আমার আম্মার পছন্দ হয়নি। সেই জন্য বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল। আমি মায়ের অমতে তোমাকে জোর করে বিয়ে করেছি। তাই তুমি তার কথামত চলে, তারও আব্বার সেবা-যত্ন করে আম্মাকে সন্তুষ্ট করবে। আমি প্রথম সন্তান। আমার ও তোমার উপর তাদের অনেক আশা ভরসা। আম্মার দোষ কোনোদিন ধরবে না। সংসার ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কিছু হবে। তুমি সে সব নীরবে সহ্য করবে। তুমি ঘরের বড় বৌ। সবাই তোমার কাছে নানা রকম আবদার করবে। তাদের আবদার সাধ্যমত পূরণ করার চেষ্টা করবে। তারপর হারুন স্ত্রীর দুটো হাত নিজের দু'গালে চেপে ধরে বলল, রোকা, আমার কথাগুলো মনে রাখবে তো?

রোকেয়া বলল, ইনশাআল্লাহ রাখব। আপনি দোওয়া করুন, আল্লাহপাক যেন আমাকে আপনার কথামত চলার তওফিক দেন।

হারুন তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, করব কি? এখনই করছি। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে মোনাজাত করল, "আল্লাহপাক, তোমার ইশারাতেই কুল মখলুকাত পরিচালিত হচ্ছে। তুমি সমস্ত সৃষ্টি জীবের মনের কথা জান। তুমি আমার ও আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর মনের সমস্ত নেক মকসুদ পূরণ কর। আমাদের সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবনে তোমার রহমত বর্ষণ কর। আমার প্রিয়তমা রোকাকে এবং আমাকে সংসারের সব রকমের অশান্তি সহ্য করার তওফিক দাও। আমাদের সব রকমের গোনাহ মাফ করে সদা সত্য পথে চালিত কর।" তারপর আমিন বলে মোনাজাত শেষ করল।

রোকেয়াও এতক্ষণ স্বামীর সঙ্গে দু'হাত তুলে আমিন আমিন করছিল। মোনাজাত শেষ হতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আম্মা আমাকে পছন্দ করেন না, এই কথা মনে হলে আমার ভয় করে।

হারুন তাকে আদর করতে করতে বলল, ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি তো আছি। আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে আম্মার মন জয় করার চেষ্টা করবে। আব্বার দিকেও সব সময় লক্ষ্য রাখবে। জানতো "পিতামাতার পদতলে সন্তানের বেহেস্ত?" তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখলে যেমন ইহকালে ও পরকালে সুখ-শান্তি পাওয়া যায়, তেমনি অসন্তুষ্ট রাখলে ইহকালে দুঃখ ও অশান্তিতে ভুগতে হয় এবং পরকালে ও অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হয়। এবার অন্য কথায় আসি। দেখ রোকা, তুমি আর আমি কত কাছে, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কত দূরে।

রোকেয়া কথাটা বুঝতে না পেরে বলল, কেন প্রিয় এমন কথা বলছেন? আমি তো আপনার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছি।

হারুন হেসে উঠে বলল, তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে এতক্ষণ আপনি করে বলে দূরে সরিয়ে রেখেছ কেন?

রোকেয়া ও হেসে উঠে বলল, তাই বল; আমি তো তোমার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

হারুন বলল, এই তো আমর প্রাণের রোকা আমাকে এবার কাছে টেনে নিল, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তুলল।

রোকেয়া প্রথম দিকে লজ্জায় চুপ করে থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিদানে মেতে উঠল।

এভাবে তারা সারারাত আনন্দ ফূর্তি করে কাটাল।

হানুফা বিবির আব্বা আনসার উদ্দিন খুব অমায়িক লোক। বয়স ষাটের উপর। খুব রসিক লোক। বিয়ের পরের দিন তিনি রোকেয়ার চুল ও চোখের গোড়ার তিল দেখে হাসতে হাসতে বললেন, এই যে নাতবৌ, এইসব দেখলাম বলে রাগ করলে নাকি? আমরা যাকে পছন্দ করেছিলাম, তাকে পেলাম কি না টেস্ট করলাম। তারপর তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। সেখানে হারুনসহ অন্যান্যরা যারা ছিল, তারাও হাসিতে যোগ দিল।

রোকেয়ার নানি রহিমন বিবি দু'দিন থেকে কাল সকালে চলে যাবেন। রাতে সে কথা জানাতে রোকেয়া নানিকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগল।

রহিমন বিবি নাতনিকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বললেন, কাঁদিস না বোন কাঁদিস না। কেঁদে আর কি করবি। মেয়েদের আসল বাড়ি হল স্বামীর বাড়ি। সংসারের সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা করবি। শ্বশুর শাশুড়ীকে নিজের মা-বাবার মত মনে করবি। ওঁরা কিছু বললে, প্রতি উত্তর করবি না। তোর মা-বাবাও তো অনেক সময় তোকে বকাবকি করেছে। ওঁরা যদি তাই করেন, তাহলে মনে করবি নিজের মা বাবা করছেন। আর শোন, ঠিকমত নামায রোযা করবি। স্বামীর মনে কোনোদিন কষ্ট দিবি না। যা বলবে তৎক্ষণাৎ তা শুনবি। মনে রাখিস, "স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত।" আমাদের নবী (সঃ) এর মেয়ে মা ফাতেমা (রাঃ)-র একটা ঘটনা বলছি শোন, একদিন মা ফাতেমা (রাঃ) নিজেকে ফুলের রাণী গোলাপ ফুলের সঙ্গে তুলনা করলেন। তখন হযরত আলী (কঃ) বললেন, গোলাপ ফুল কিন্তু তাড়াতাড়ি মলিন হয়ে যায় এবং ঝরেও যায়। এই কথায় মা ফাতেমা (রাঃ)র মনে একটু অভিমান হল। তিনি নবী করিম (সঃ) এর কাছে এসে স্বামীর কথা বলে নালিশ করলেন। নবী করিম (দঃ) বললেন, তোমার নালিশের ফায়সালা পরে করব। তার আগে অমুক মহল্লায় যে কাঠুরিয়া বাস করে,তার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা করে এস।

মা ফাতেমা (রাঃ) সেই কাঠুরিয়ার বাড়ির দরজায় এসে সালাম জানালেন।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী দরজা না খুলে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, কে আপনি?

মা ফাতেমা (রাঃ) নিজের পরিচয় দিলেন। কাঠুরিয়ার স্ত্রী বললেন, বেয়াদবি মাফ করবেন, আপনি আগামীকাল আসুন। আমি আপনার আগমনের কথা বলে আমার স্বামীর হুকুম নিয়ে রাখব।

মা ফাতেমা (রাঃ) ফিরে এলেন। পরেরদিন কাঠুরিয়ার বাড়িতে যখন রওয়ানা হবেন তখন ছোট ছেলে হযরত হোসায়েন (রাঃ) বললেন, আম্মা, আমি আপনার সঙ্গে যাব। উনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাঠুরিয়ার বাড়ির দরজায় এসে সালাম জানালেন।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী সালামের উত্তর দিয়ে দরজা খুলে সঙ্গে একটা ছেলে দেখে বললেন, মাফ করবেন, আমি আমার স্বামীর কাছে শুধু আপনার আসার হুকুম নিয়েছিলাম। তাই এই ছেলেসহ বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারব না। আগামীকাল আসুন, আমার স্বামীর হুকুম নিয়ে রাখব।

মা ফাতেমা (রাঃ) ফিরে এলেন। পরের দিন যাওয়ার সময় হযরত হাসান ও হোসায়েন (রাঃ) দু'জনেই মায়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে জীদ ধরলেন। ছোট ছোট ছেলেদের আবদার তিনি না রেখে পারলেন না। দু'ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কাঠুরিয়ার দরজায় এসে সালাম দিলেন।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী সালামের উত্তর দিয়ে দরজা খুলে আজ দুটো ছেলেকে দেখে বললেন, মাফ করবেন, আজও আপনাকে ভিতরে আসতে দিতে পারছি না। কারণ আমি স্বামীর কাছ থেকে একটা ছেলের কথা বলে হুকুম নিয়েছিলাম। আপনি দয়া করে আগামীকাল আসুন।

অগত্যা বাধ্য হয়ে মা ফাতেমা (রাঃ) সেদিনও ফিরে এলেন।

ঐ রাতে কাঠুরিয়া বাড়িতে ফিরে আসার পর যখন তার স্ত্রী ঘটনাটা বললেন তখন খুব রেগে গিয়ে বললেন, তুমি এই ক'দিন খুব অন্যায় করেছ। মা ফাতেমা (রাঃ) যদি দুনিয়াশুদ্ধ লোক নিয়ে আসেন, তবুও তাকে আর ফেরাবে না।

চতুর্থ দিন মা ফাতেমা (রাঃ) দু'ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাঠুরিয়ার বাড়িতে এসে সালাম দিলেন।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী সালামের উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অতি ভক্তি ও সম্মানের সাথে ঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে বললেন, এই ক'দিন আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি খুব অন্যায় করেছি। আমাকে মাফ করে দিন।

মা ফাতেমা প্রতিদিন ফিরে যাওয়ার সময় কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কথা এবং নবী করিম (সঃ) কেন তাকে এনার কাছে দেখা করতে বললেন, এর ভেদ কি, চিন্তা করে কিছু সমাধান করতে পারেন নাই। এখন কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কথা শুনে কিছু না বলে সেই কথা আবার চিন্তা করতে লাগলেন। কাঠুরিয়ার স্ত্রী সাধ্যমত খাতির যত্ন করে নাস্তা পানি করালেন। নাস্তা পানির পর মা ফাতেমা (রাঃ) ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, রশি, ছেঁড়া জুতো, ছোট বড় পাথর এবং কয়েক পদের চাবুক বেশ সুন্দর করে একপাশে গোছান রয়েছে। এইসব দেখে তাঁর মনে বেশ কৌতুহল জন্মাল। কথা বলতে বলতে এক সময় কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে ঐগুলোর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ জিনিসগুলো অত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন কেন?

কাঠুরিয়ার স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী সারাদিন কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরেন। সারাদিন পরিশ্রম করার ফলে কোনো কোনোদিন তার মেজাজ গরম থাকে। সেদিন বাড়িতে এসে সামান্য কোনো কারণে রেগে গিয়ে আমাকে মারধর করেন। আমাকে মারার জন্য যাতে কোনো কিছু খোঁজা-খুঁজি করতে না হয় সেজন্যে আমি ঐগুলো রেখেছি। যেটা দিয়ে ওঁর আমাকে মারার ইচ্ছা হবে, সেটা সহজেই হাতের কাছে পেয়ে যাবেন।

কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কথা শুনে মা ফাতেমা (রাঃ) যেমন খুব অবাক হলেন তেমনি তার স্বামী ভক্তির কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বুঝতে পারলেন, তার কথাগুলো শুনে নবী করিম (সঃ) কেন তাকে আগে কাঠুরিয়ার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে মা ফাতেমা (রাঃ) স্বামী হযরত আলী (কঃ) র পায়ে ধার ক্ষমা চেয়ে নেন।

ঘটনাটা বলে রহিমন বিবি রোকেয়ার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, শুনলি তো কাঠুরিয়ার স্ত্রীর স্বামীভক্তির কথা? আজকালের মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে স্বামীকে গ্রাহ্য করে না, এটা যে কতবড় গোনাহর কাজ তা যদি জানত, তাহলে করতে পারত না। দো'য়া করি, "আল্লাহপাক যেন তোকে মা ফাতেমা (রাঃ) এর মত স্বামীভক্ত স্ত্রী করেন।"

রোকেয়া নানির পায়ে হাত ছুঁয়ে সালাম করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আপনি দো'য়া করুন নানি, আমি যেন আপনার সব কথা মেনে চলতে পারি।

রহিমন বিবি নাতনির মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ তোকে সব কিছু সহ্য করার ও সব কিছু মেনে চলার তওফিক দান করুক।

পরের দিন সকালে নাস্তা খেয়ে তিনি চলে গেলেন।

চার

রহিমন বিবি চলে যাওয়ার পর ঐ দিনই হানুফা বিবি রোকেয়াকে সংসারের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

রোকেয়া বাপের বাড়িতে সংসারের কাজ করে বড় হয়নি। তার মা মেহেরুন্নেসা মাঝে মাঝে বকাঝকা করে শুধা রান্না করা শিখিয়েছেন। রোকেয়া শ্বশুর বাড়ি এসেই শাশুড়ীর যা পরিচয় পেয়েছে তাতে ভয়ে তার বুক কাঁপে। তার উপর নূতন বৌ। কোনো কাজ করতে গেলে ভুল না হলেও ভুল হয়ে যায়।

তাই দেখে হানুফা বিবি প্রথম দিন থেকেই রোকেয়ার উপর রাগারাগি শুরু করলেন। যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন।

শাশুড়ীর ব্যবহারে রোকেয়া মনে ভীষণ আঘাত পেল। তবু কিছু না বলে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে ভাসাতে সংসারের কাজকর্ম করতে লাগল। আর মনে মনে আল্লাহ পাকের কাছে জানাল, "আল্লাহ পাক, তুমি যখন আমার তকদিরে এইসব রেখেছ তখন আমাকে সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা দাও।"

একদিন রোকেয়া ঘরদোর পরিষ্কার করে আবর্জনাগুলো ঘরের পিছনে ফেলে দিয়ে এলে হানুফা বিবি ঝংকার দিয়ে বললেন, তোর মা কাজ না শিখিয়ে বিদেশী জামাই পেয়ে বিয়ে দিয়ে দিল। জেনে রাখ, সংসারের কাজকর্ম যেমন তেমন করে করা চলবে না। তারপর উঠোনের কয়েক দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন, ঐ সব জায়গায় আবর্জনা রয়েছে চোখে দেখিস না? এতবড় ধিঙ্গী মেয়ে ঝাড়ু দিতেও জানিস না, না এখন থেকেই কাজে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করছিস?

রোকেয়া উঠোনের চারপাশে তাকিয়ে কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে বলল, কই আম্মা, আমি তো কোনো আবর্জনা দেখছি না।

হানুফা বিবি গর্জন করে উঠলেন, কি তোর এতবড় স্পর্ধা? কাল বৌ হয়ে এসে আমার মুখে মুখে তর্ক? হারুন ঘরে আসুক, এর বিহিত করে ছাড়ব।

রোকেয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে পরিষ্কার উঠোন আবার ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করল।

সেদিন রাতে হারুন ঘরে এলে হানুফা বিবি ছেলেকে খুব রাগের সাথে বললেন, তোর বৌ উঠোন ঝাঁট দিতে জানে না। তাই আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলে আমার মুখে মুখে তর্ক করেছে। তুই এর বিহিত কর। মেয়ে দেখতে গিয়ে ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, এই মেয়ে ভালো হবে না।

রোকেয়া তখন নিজের ঘরে ছিল। হারুন তার কাছে গিয়ে বলল, রোকা, আম্মা কি বলল শুনেছ?

রোকেয়া আর কি বলবে, শাশুড়ীর মিথ্যে অভিযোগ শুনে তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। ভাবল, সত্য কথা বললে, মা ও ছেলের মধ্যে ঝগড়া হবে। তাই সে চুপ করে রইল।

হারুন বলল, আমার কথার উত্তর দেবে না?

রোকেয়া চোখ মুছে বলল, আমি কোন দিকে যাব? কাজ করলেও দোষ আর না করলেও দোষ।

হারুন বলল, সে কথা আমি জানি। আম্মার মুখে মুখে তর্ক করেছ নাকি?

রোকেয়া উঠোন ঝাঁট দেওয়ার সময় যা বলেছিল তা বলল।

ঃ তুমি তো জান রোকা, আম্মা ঐ রকম। তবু কেন কথা বলতে গেলে? তোমাকে বলেছি না, আম্মা সত্য মিথ্যা যাই বলুক না কেন, তুমি কোনো উত্তর করবে না?

ঃ আমার ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দাও। আর কখনো এ রকম হবে না। হারুন তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, মাফ চাইলে কেন? আমার কথায় রাগ করেছ নিশ্চয়?

রোকেয়া আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, রাগ করব কেন? ভুল করেছি, সে জন্য মাফ চাইলাম।

কয়েক দিন পর হানুফা বিবি রোকেয়াকে বললেন, আমি বাপের বাড়ি যাব, তুই সংসারের সব কাজ সামলাতে পারবি তো?

রোকেয়া শ্বশুর বাড়ি আসার পর থেকে শাশুড়ীকে তার সঙ্গে তুই সম্বোধন করে কথা বলেন বলে এবং গালাগালি করেন বলে তার মনে খুব ব্যথা লাগে। তারপর নিজের মনকে বুঝিয়েছে, তার আম্মাও তো তাকে তুই করে বলে। এই কথা ভেবে মনকে বোধ দিয়েছে। আজ শাশুড়ীর কথা বলার ধরন দেখে ব্যথাটা আবার টনটন করে উঠল। সেটাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, হ্যাঁ আম্মা, আমি সবকিছু সামলাতে পারব। সেদিন বিকেলে হানুফা বিবি বাপের বাড়ি চলে গেলেন।

রোকেয়ার মেজ ভাই বখতিয়ার একদিন সকালের দিকে রোকেয়াদের বাড়িতে এসে তাকে বলল, নানির খুব অসুখ। তুই দেখতে যাবি না?

রোকেয়া বলল, ওতো ঘরে নেই। তুমি এবেলা থাক। সে ঘরে এলে বিকেলে তিনজনে এক সঙ্গে যাব।

বখতিয়ার বলল, ঠিক আছে তাই হবে।

হারুন দুপুরে ফিরে বখতিয়ারকে দেখে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল।

বখতিয়ার বলল, আমরা সবাই আল্লাহ পাকের রহমতে ভালো আছি। তবে নানির খুব অসুখ। তাই তোমাদেরকে খবরটা দিতে এলাম।

হারুন বলল, তাই নাকি? তাহলে তো নানিকে দেখতে যাওয়া আমাদের উচিত।

তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর। তোমাকে নিয়ে নানিকে দেখতে যাব।

রোকেয়া বলল, আম্মা বাড়িতে নেই। আমি যাব কি করে? তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে তুমি মেজ ভাইয়ার সঙ্গে গিয়ে দেখে এস।

হারুন বলল, আম্মা নেই বলে তুমি নানির কঠিন অসুখের কথা শুনেও দেখতে যাবে না, এ কেমন কথা? আমরা তো আর সেখানে থাকতে যাচ্ছি না? নানিকে দেখে চলে আসব। খেয়ে দেয়ে তুমিও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

বিকেল চারটের সময় হারুন, বখতিয়ার ও রোকেয়া নানির বাড়িত এসে পৌছাল।

নানিকে দেখে নাস্তা খেয়ে হারুন রোকেয়াকে নিয়ে ফিরে এল।

পরের দিন রোকেয়া হারুনকে বলল, কতদিন হয়ে গেল আম্মা গেছেন। তুমি গিয়ে নিয়ে এস।

হারুন সেইদিন বিকেলে গিয়ে আম্মাকে নিয়ে এল।

হানুফা বিবি আসার পর রোকেয়ার ছোট দেবর মজিদ মাকে বলল, ভাবি ভাইয়াকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল।

এই কথা শুনে হানুফা বিবির মুখে থেকে তুফান শুরু হল। সাগরের গর্জনের মতো গলার আওয়াজ করে বৌকে উদ্দেশ্য করে বললেন , আমি বাড়িতে না থাকলে তোর খুব সুবিধে হয়। স্বামীকে নিয়ে হেথা সেথা বেড়াবার সুযোগ পাস। এটা সেটা বাপের বাড়ি চালান করতে পারিস। তাই তো বলি, দশ বার দিন হয়ে গেল হারুন আমাকে নিয়ে আসেনি কেন? কেমন আছি একবার দেখতেও আসল না?

শাশুড়ীর কথায় রোকেয়ার চোখে পানি এসে গেল। কোনো কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেল। হারুন তখন ঘরে ছিল না। ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে সবকিছু শুনে মায়ের কাছে এসে বলল, আম্মা, তুমি তোমাদের বৌকে কি বলেছ। আমার নানি শাশুড়ীর কঠিন অসুখের খবর পেয়ে আমিই তোমার বৌকে নিয়ে গতকাল দেখতে গিয়েছিলাম। তার বাপের বাড়ি যাইনি।

হানুফা বিবি আরো রেগে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। তোকে আর বৌয়ের হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। তুই তোর কাজে যা।

হারুন আর কিছু না বলে রুমে এসে রোকেয়াকে কাঁদতে দেখে বলল, আম্মার কথায় কেঁদো না। জান তো আম্মা ঐ রকম। আমি তুমি ঠিক থাকলে কেউ কিছু বললেও আমাদের কিছু যায় আসে না।

এর তিন চারদিন আগে থেকে হারুনের বাবা বদরুদ্দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাঁটতে পারেন না। কথাও ঠিকমতো বলতে পারেন না। উল্টো পাল্টা বলেন। হারুন ডাক্তার নিয়ে এসে দেখিয়েছে। এই ডাক্তার তাঁর এ্যাকসিডেন্টের পর থেকে দেখছেন।

ডাক্তার দেখে বলেছেন, এরকম তো প্রায়ই হয়। কয়েকদিন পর ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

হারুন ঘরে চলে যাওয়ার পর হানুফা বিবি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে ভাত খেয়েছ?

বদরুদ্দিন বললেন, না বৌমা আমাকে খেতে দেয়নি।

হানুফা বিবি আর যান কোথায়? স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বাড়ির লোকজনদের ডেকে বললেন, এত লোক থাকতে হারুনের বাপকে কেউ এক

মুঠো ভাত দিতে পারল না। আজ ক'দিন ধরে সে উপোস রয়েছে। আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাই তোমরা এই অসুস্থ লোকটাকে না খাইয়ে রেখেছ?

রোকেয়ার দু'জন দেবর শামসু ও হোসেন সেখানে ছিল। তারা বলল, আম্মা তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আব্বা যে উল্টো পাল্টা কথা বলে সেটাতো আজ নূতন নয়। পাঁচ ছ বছর ধরে এ রকম করছে। জেনেশুনে কেন তুমি এরকম বলছ?

হারুনও বাইরে এসে বলল, আমাদের সকলের সাথে তোমাদের বৌ যদি আব্বাকে না খাওয়াত, তাহলে না হয় আব্বার কথা বিশ্বাস করা যেত। আম্মা, তুমি যা আরম্ভ করেছ, তা লোকে শুনলে কি বলবে?

হানুফা বিবির তবু রাগ পড়ল না। বললেন, লোকে যাই বলুক না কেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? সেদিন তোর বৌ বলল, সে সবদিক সামলাতে পারবে। তাই বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, কেন বলেছিল। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তোরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে ফুর্তি করে কাটিয়েছিস। কে খেল না খেল সেদিকে খেয়াল করবি কেন?

হারুন বলল, আমরা কি তোমাকে সেধে পাঠিয়েছিলাম, না তুমি নিজে যাবে বলে তোমার বৌকে সবকিছু সামলাতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে? যদি সে বলত পারব না, তখন তো তার দোষ দিতে। আর পারবে বলতে তার দোষ হয়ে গেল? তুমি যে কেন এমন কাণ্ড শুরু করেছ, তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ছেলের কথা শুনে হানুফা বিবি বললেন, বিয়ে করেছিস তো, এখন বৌয়ের হয়ে কথা না বললে তার মন পাবি কেন? তারপর গজর গজর করতে করতে নিজের রুমে চলে গেলেন।

হারুনের বাবা বদরুদ্দিন খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র জানতে পেরে তাকে খুব কড়া শাসনে রাখতেন। এ্যাকসিডেন্টের পর যখন উনি প্রায় দু'বছর প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন এবং ব্রেনের ডিফেক্ট হয়ে গেল তখন থেকে হানুফা বিবি বেপরোয়া হয়ে উঠেন।

বদরুদ্দিন রোকেয়াকে খুব ভালবাসেন। সারাদিন রোকেয়াকে বৌমা বৌমা করে ডাকেন। রোকেয়া এসে যদি জিজ্ঞেস করে, কেন ডেকেছেন আব্বা? তখন বলেন, এমনি ডেকেছি। আসলে এ্যাকসিডেন্টের পর থেকে শারীরিক কিছু সুস্থ হলেও মাথার গোলমাল রয়ে গেছে। কখন কাকে কি বলেন কিছুই মনে রাখতে পারেন না।

রোকেয়া বৌ হয়ে আসার পর একদিন হানুফা বিবিই তাকে স্বামীর এই অবস্থার কথা বলে বলেছিলেন, তোর শ্বশুরের কথায় তুই কিছু মনে করিস না। সেই জন্যে বদরুদ্দিন বৌকে ভালবাসলেও যখন মাঝে মাঝে গালাগালি করেন তখন রোকেয়া কিছুমনে করে না। উনি রেগে গেলে শুধু রোকেয়াকে নয়, বাড়ির সবাইকে গালাগালি করেন।

একদিন রান্নার ব্যাপার নিয়ে হানুফা বিবি রোকেয়ার বাপ মা তুলে যাচ্ছে তাই করে গালাগালি করলেন।

এর আগেও রোকেয়া শাশুড়ীর অনেক গালাগালি সহ্য করেছে। কিন্তু আজ তার মা-বাপ তুলে গালাগালি করাতে তার মনে খুব কষ্ট হল। সহ্য করতে না পেরে বলল, আপনি যখন তখন শুধু শুধু আমাকে গালাগালি করেন; তবু আমি কিছু বলি না। কিন্তু আমার মা-বাপকে গালাগালি করছেন কেন? এখানে তারা কি দোষ করল?

হানুফা বিবি রেগে আগুন হয়ে বললেন, কি বললি তুই! এত দেমাগ তোর? আমার মুখের উপর আবার কথা বলা? তোকে আমি পছন্দ করে আনি নাই যে, আদর সোহাগ করব। আর তোর মা-বাপ কোন দেশের নবাব-বেগম যে, কিছু বললে, তাদের অপমান হবে? আমার যা ইচ্ছা তাই বলব, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আজ হারুন ঘরে আসুক জিজ্ঞেস করব, সে তোকে আমার সাথে ঝগড়া করতে শিখিয়ে দিয়েছে কিনা?

শাশুড়ীর কথা শুনে রোকেয়া আকাশ থেকে পড়ল। ভাবল, আমি আবার ঝগড়া করলাম কখন? যদি বলি আম্মা, আপনি এ আবার কি কথা বলছেন, তাহলে হয়তো আরো যা তা বলে গালাগালি করবেন? তাই আর কথা না বাড়িয়ে রুমে এসে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল, যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এলাম তখন কত আশা, কত আনন্দ ছিল। মনে করেছিলাম, শ্বশুর বাড়ি খুব সুখের হয়। কত স্বপ্ন, কত কল্পনার জাল বুনেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না যে, সাংসারিক জীবনে কত দুঃখকষ্ট আছে। হায়রে ভাগ্যের পরিহাস, সারাজীবন এখানে কাটাব কি করে? এই সব চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

হারুন ঘরে এলে হানুফা বিবি ছেলেকে অনেক কিছু মিথ্যে বানিয়ে বৌয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে বললেন, তুই কি বৌ করে এনেছিস আমার সঙ্গে ঝগড়া করাবার জন্য? তুই যদি এর বিহিত না করিস, তাহলে এখানে এক ঘোঁট পানিও খাব না।

হারুন মায়ের স্বভাব জানলেও তার শেষের কথা শুনে রোকেয়ার উপর খুব রেগে গেল। রুমে এসে তাকে কিছু বলতে গিয়ে তার বিমর্ষ মুখ দেখে থেমে গেল। বুঝতে পারল মা এমন কিছু আজ বলেছে, যে জন্যে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। খাটের কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলল, রোকা উঠ।

রোকেয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বলল, কখন এলে?

হারুন বলল, এই তো এলাম। তারপর আবার বলল, আজ আম্মার সঙ্গে আবার কি হল, যে জন্য সে এখানে কিছু খাবে না বলেছে?

রোকেয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যা কিছু হয়েছিল বলল।

হারুন জানে রোকেয়া কোনোদিন অন্যায়ভাবে আম্মার সাথে কথা বলবে না। তবু মায়ের কথা শুনে আজ রোকেয়ার উপর খুব রেগে গিয়েছিল। কিন্তু রুমে এসে তার অবস্থা দেখে ও তার কথা শুনে সেই রাগ আর রইল না। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর দিতে দিতে বলল, চল আমার সঙ্গে আম্মার পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নেবে। তা না হলে আম্মা যখন একবার বলেছে এখানে কিছু খাবে না তখন সত্যিই না খেয়ে থাকবে। নচেৎ বাপের বাড়ি চলে যাবে। সেখানে আবার তোমার ও আমার নামে দুর্নাম রটাবে। তখন কেলেংকারীর শেষ থাকবে না।

রোকেয়া স্বামীর আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, তুমি খুব খাঁটি কথা বলেছ। চল যাই।

হারুন রুম থেকে বেরোবার আগে রোকেয়া শাশুড়ীর কাছে এসে তার দু'পা জড়িয়ে ধরে বলল, আম্মা আমার অন্যায় হয়ে গেছে; আমাকে মাফ করে দিন। তারপর সে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হানুফা বিবি বৌকে কাঁদতে দেখে মনে করলেন, হারুন নিশ্চয়ই তাকে মারধর করেছে। তাই মনে মনে খুশী হয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে চুপ করে রইলেন।

একটু পরে হারুন সেখানে এসে মায়ের একটা হাত ধরে বলল, তোমার বৌকে যা করার করেছি। এবার চল ভাত খেতে দেবে, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

হানুফা বিবি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বৌকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোরা যা আমি আসছি।

ঐদিন রাতে ঘুমোবার আগে হারুন রোকেয়াকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কবে বিয়ে হয়েছিল তোমার মনে আছে?

রোকেয়া বলল, ঐ দিনটার কথা কি কেউ ভুলে? ঐ দিনটা চিরকাল আমার অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। হঠাৎ ঐ দিনের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

হারুন বলল, না এমনি জিজ্ঞেস করে দেখলাম, তোমার মনে আছে কিনা। আমিও ঐ দিনের কথা জীবনে ভুলতে পারব না। তারিখটা তোমার মনে আছে?

রোকেয়া বলল, ১০-৪-৮৩ইং তারিখ।

হারুন তাকে আদর করতে করতে বলল, আজ ১০-৭-৮৩ তারিখ। আমি এই মাসের ২৩ তারিখে বিদেশ চলে যাব। তোমাকে ছেড়ে যেতে মোটেই ইচ্ছা করছে না। সত্যি রোকা, তোমার জন্য আমার খুব দুঃখ হয়, কেন যে তোমাকে বিয়ে করে এত কষ্ট দিচ্ছি? যদি জানতাম, বিয়ের পর এত দুঃখ কষ্ট পেতে হয়, তাহলে বিয়েই করতাম না। তার উপর তোমাকে রেখে চলে যাব, আবার কবে তোমাকে পাব, সে কথা মনে করে ভীষণ খারাপ লাগছে। তারপর কান্নায় তার গলা বুঝে এল।

রোকেয়া আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, তুমি আমাকে ধৈর্য্য ধরার কথা বলে নিজেই ধৈর্য্যহারা হচ্ছ কেন? বরং তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে অতদিন থাকব, সে কথা তোমার ভাবা উচিত। আম্মার এতকিছু অত্যাচার তোমাকে দেখলেই ভুলে যাই। তুমি চলে গেলে কাকে দেখে ভুলব বলতে পার? বিরহ জ্বালা কি তুমি একাই পাবে, আমি পাব না?

হারুন ভিজে গলায় বলল, রোকা, তুমি এমন করে বলো না। সেই কথা ভেবেই তো আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু কি করি বল, আমাদের বিষয় সম্পত্তি তেমন নেই যে, ঘরে থাকলে সংসার চলবে। তাই তো মন না চাইলেও আপনজনদের ফেলে সুদূর বিদেশে যেতে হচ্ছে। যদি সংসার চলার মত কিছু সংস্থান থাকত, তাহলে কি কেউ সখ করে আপনজনদের ফেলে বিদেশে যেতে চায়? আমার ইচ্ছা হয়, সব সময় তোমার পাশে থাকি। তারপর চোখ মুছে বলল, আল্লাহ আবার কবে তোমার কাছে নিয়ে আসবেন, তা তিনিই জানেন।

স্বামীর কথা শুনতে শুনতে রোকেয়ার চোখ থেকেও পানি পড়ছিল। সেই অবস্থাতে তার বুকে মাথা রেখে বলল, তুমি চলে যাবে শুনে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। তোমাকে ছেড়ে আমিই বা কি করে থাকব, সে কথা ভেবে পাচ্ছি না। সংসারে যত অশান্ত পাই না কেন, তোমার চাঁদ মুখ দেখলেই সে সব কর্পূরের মত উড়ে যায়। মন শান্তিতে ভরে যায়। তুমি চলে গেলে আমি কি করে এখানে দিন গুজরান করব, তুমি বলে দাও প্রিয়তম।

হারুন তাকে আদর দিতে দিতে বলল, ধৈর্য্য ধর রোকা ধৈর্য্য ধর। তোমাকে রেখে যেতে আমারও যে খুব কষ্ট হবে তা তুমিও জান। তুমি এত ভেঙ্গে পড়লে আমি যাব কি করে? রোকেয়ার মাসিকের ডেটমত মাসিক না হয়ে বেশ কয়েকদিন আগে পার হয়ে গেছে, সে কথা হারুন জানে। তাই অনুমান করে তার চোখ মুখ মুছে দিয়ে বলল, এই

রোকা, আল্লাহ চাহে যদি সত্যি সত্যি তোমার পেটে বাচ্চা এসে থাকে। তাহলে আমি বলছি, আমাদের ছেলে হবে। এই কথা শুনে রোকেয়া ভীষণ লজ্জা পেয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইল।

ঃ কি হল কিছু বলছ না যে?

ঃ এসব কথা বললে আমার লজ্জা পায় না বুঝি?

ঃ লজ্জা আছে বলে পাচ্ছে। তাই বলে যা সত্য তা বলব না? বল না, ছেলে হবে, না মেয়ে হবে?

ঃ সে কথা আল্লাহপাক জানেন, আমি বলব কি করে? তবে আমার ইচ্ছা প্রথমে মেয়ে হোক। এখন ও কথা থাক, সত্যি কি আর পেটে বাচ্চা এসেছে? মাঝে মাঝে আমার মাসিকের ডিষ্টার্ব হয়।

তিন চার দিন পরের ঘটনা। সেদিন রোকেয়ার শরীর বেশ খারাপ লাগছিল বলে সংসারের কাজকর্ম না করে শুয়েছিল।

তাই দেখে হানুফা বিবি তার রুমের দরজার কাছে এসে বড় গলায় বললেন, নবাবজাদীর মতো শুয়ে আছিস যে? বাপের বাড়ি থেকে পাঁচ দশটা বাঁদী এনেছিস বুঝি? তারা সংসারের কাজ করবে? ভালো চাসতো উঠে কাজকর্ম কর নচেৎ কি করি বুঝবি।

রোকেয় শাশুড়ীর কথা শুনে উঠে বসতে গেল; কিন্তু মাথা ঘুরে যেতে আবার শুয়ে পড়ল।

হানুফা বিবি তা লক্ষ্য করে বললেন, একটা ব্যামো মেয়ে এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছে। বাপ-মাকে খবর দে, তারা এসে নিয়ে যাক। চিকিৎসা করাক। আমার অত টাকা পয়সা নেই যে, তোর চিকিৎসা করাব।

এমন সময় হারুন ঘরে এসে মায়ের কথা শুনে বুঝতে পারল, রোকেয়ার কিছু অসুখ বিসুখ হয়েছে। মাকে বলল, আম্মা তুমি এসব কি বলছ? মানুষের কি অসুখ বিসুখ করে না? এর আগে তো তোমার বৌয়ের কোনোদিন কিছু হয়নি। তারপর মা কিছু বলার আগে আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেল।

হানুফা বিবি আরো রেগে গিয়ে বৌয়ের গুষ্ঠি তুলে গাল দিতে দিতে সংসারের কাজ করতে লাগলেন।

রোকেয়া সেসব সহ্য করতে না পেরে কাজ করার জন্য আরো দু'তিন বার বিছানা ছেড়ে উঠার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারেই মাথা ঘুরে চোখতলা ধুঁয়া হয়ে গেল। শেষে বিফল হয়ে শুয়ে শাশুড়ীর গালাগালি শুনতে শুনতে চোখের পানি ফেলতে লাগল।

ঘন্টাখানেক পরে হারুন ডাক্তার নিয়ে ফিরে এল।

ডাক্তার রোকেয়াকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপসান করার সময় হারুনকে বললেন, খুব সম্ভব আপনার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। ওঁকে এখন থেকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে বলবেন। তারপর তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর হারুন লজ্জায় মাকে ডাক্তারের কথা বলতে পারল না। টাকা নিয়ে ওষুধ কিনতে চলে গেল।

ডাক্তার যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ হানুফা বিবি চুপ করেছিলেন। ডাক্তার ও ছেলে বেরিয়ে যেতে আবার গজরাতে লাগলেন, কি পাপ না ঘরে এনেছি। এই মেয়ের দ্বারা আমার সংসারের অনেক ক্ষতি হবে। বেশি কিছু বলাও বিপদ। স্বামী ঘরে এলেই আমার বিরুদ্ধে লাগবে। ডাইনী আমার ছেলেকে যাদু করেছে। যাক হারুন এলে বলব, এই বৌ

নিয়ে তুই কোনেদিন সুখী হবি না। একে ছেড়ে দে। আমি ভাল মেয়ে দেখে আবার তোর বিয়ে দেব।

রোকেয়া শাশুড়ীর কথা শুনে মনে ভীষণ আঘাত পেল। অনেক কিছু বলতে তার ইচ্ছা করল; কিন্তু বলে কোনো লাভ হবে না। বরং উল্টো কিছু হতে পারে ভেবে চুপ করে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজাতে লাগল।

হারুন ওষুধ নিয়ে এসে রোকেয়াকে খাওয়াতে গেলে রোকেয়া কাঁদতে কাঁদতেই বলল, কি হবে ওষুধ খেয়ে? আমি ভালো হতে চাই না। আমাকে তুমি বিষ এনে দাও। খেয়ে তোমাদের পথের কাঁটা দূর হয়ে যাই। সবাই জানবে অসুখ হয়ে মারা গেছি। আর তা না হলে আমাকে তালাক দিয়ে চির জনমের মত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। তারপর সে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

হারুন তার কথা শুনে বুঝতে পারল, সে ওষুধ আনতে চলে যাওয়ার পর আম্মা নিশ্চয় যা তা করে অনেক গালাগালি করেছে। বলল, ছিঃ রোকা, এরকম কথা তুমি বলতে পারলে? আম্মা তোমাকে যা কিছু বলুক না কেন, আমি কি তোমাকে কোনোদিন কিছু বলেছি? না আমার কাছ থেকে কোনো রকম অবহেলা পেয়েছ? তোমাকে আমি কত ভালবাসি, তাকি তুমি জান না? তোমার কিছু হলে আমিও বাঁচব না। তারপর কান্নায় তার গলা বুজে এল।

রোকেয়া স্বামীর কথা শুনে বুঝতে পারল তালাকের কথা বলা তার ঠিক হয়নি। কান্না থামিয়ে বলল, অনেক দুঃখে আমার মুখ থেকে হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেছে। তবু বলে আমি ভীষণ অন্যায় করেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও প্রিয়তম। আমারও তো রক্ত মাংসের শরীর। আর কতটুকুই বা আমার জ্ঞান? তারপর হারুন ওষুধ আনতে চলে যাওয়ার পর শাশুড়ীর যেসব কথা বলেছিলেন তা বলে বলল, ওঁর কথা শুনে এই অসুস্থ শরীরে আমার মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তাই বলে ফেলেছি। কথা শেষ করে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

হারুন তাকে প্রবোধ দিতে দিতে চোখ মুখ মুছিয়ে ওষুধ খাওয়াল। তারপর বলল, তোমার কাছে বলতেও আমার লজ্জা করছে; আম্মা যে তোমার সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বিয়ের সময় যখন আম্মা তোমাকে অপছন্দের কথা বলল, তখন ভেবেছিলাম, বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর স্ত্রীর দুগালে কয়েকটা চুমো খেয়ে বলল, ক্ষমা তুমি পেয়েছ। তবে যে কথা বলে ফেলে তুমি ক্ষমা চাইলে সেকথা যদি আবার কোনোদিন বল, তাহলে সেদিন আমার মরা মুখ দেখবে।

রোকেয়া স্বামীর মাথা দু'হাত দিয়ে ধরে গালে গাল ঠেকিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমি না হয় রাগের মাথায় ঐ কথা বলে ফেলেছি। তাই বলে তুমিও ঐ রকম কথা বললে কি করে? তুমি কি জান না, তুমি আমার সমস্ত তনুমনে মিশে রয়েছ? তোমার কিছু হলে আমিও মরে যাব বলে রাখলাম।

হারুন বলল, আমিও মানুষ। আমারও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ওয়াদা করছি আর কখনো ওরকম কথা বলব না। তুমিও ওয়াদা কর বলবে না।

রোকেয়া বলল, বেশ, আমিও ওয়াদা করলাম। আল্লাহপাক যেন আমাদেরকে ওয়াদা পালন করার তওফিক এনায়েৎ করেন।

হারুন আমিন বলে বলল, এবার একটা সুখবর শোনাব, কি খাওয়াবে বল।

ডাক্তার যখন হারুনকে রোকেয়ার সন্তান সম্ভাবনার কথা বলেন তখন রোকেয়া শুনেনি। তাই সুখবরটা কি হতে পারে ভেবে পেল না। বলল, তুমি যা খেতে চাইবে তাই করে খাওয়াব।

হারুন বলল, আমি কিন্তু খাবার খাওয়াবার কথা বলিনি।

ওমা, খাবারই তো লোক খেতে চায়। অন্য কিছু আবার খাওয়ার জিনিস আছে নাকি?

আছে আছে, তুমি না জানলে কি হবে।

তা হলে কি খাবে তুমিই বল।

হারুন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল।

রোকেয়া লজ্জায় লাল হয়ে স্বামীর পিঠে কয়েকটা কিল দিয়ে বলল, দুষ্টু। যাও তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এই কথা বলে তাকে হাত দিয়ে ঠেলে দিল।

হারুন হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে, সুখবরটা আমিও শোনাব না। এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ভান করল।

রোকেয়া খপ করে তার একটা হাত ধরে টেনে জড়িয়ে ধরে বলল, দুষ্টু লোকের সাথে দুষ্টুমী করলে দোষ হয় না। ঠিক আছে, তাই খাওয়াব। তারপর লজ্জায় স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলল, এবার সুখবরটা শোনাও।

হারুন বলল, তুমি মা হতে চলেছ। এই, তুমি মা হলে আমিও বাবা হব তাই না?

রোকেয়া আরো বেশি লজ্জা পেয়ে বলল, জানি না যাও। তুমি জানলে কি করে?

হারুন বলল, ডাক্তার বলেছেন। দেখো রোকা, আমাদের ছেলে হবে।

ঃ না, মেয়ে হবে।

ঃ আচ্ছা দেখা যাবে কার কথা ঠিক।

ঃ শুনেছি যাদের নাকি প্রথমে মেয়ে হয়। তাদের জন্য বেহেস্তের দরজা খোলা থাকে।

ঃ কথাটা আমিও শুনেছি। তবে হাদিস কালামে আছে কিনা জানি না। যাক, এবার আর একটা সুখবর শুন, আমার যাওয়ার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তাই আগামীকাল তোমাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সবাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব।

রোকেয়া খুশি হয়ে বলল, তাই হবে।

পরের দিন সকালে হারুন মাকে বলল, আজ তোমার বৌকে নিয়ে বদরপুর যাব। কয়েকদিন পরে তো আমার ফ্লাইট। তাই সকলের সঙ্গে দেখা করে আসব।

হানুফা বিবি বললেন, বৌয়ের অসুখ যাবে কি করে? বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা শুনে অসুখ ভালো হয়ে গেছে বুঝি?

হারুন মায়ের স্বভাব জানে, কিছু বরতে গেলেই তাকেও যাতা করে বলতে শুরু করবে। তাই মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে রোকেয়াকে নিয়ে একটা স্কুটারে করে রওয়ানা দিল।

শ্বশুর বাড়িতে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর হারুন রোকেয়াকে বলল, চল চাঁদপুর টাউন থেকে বেড়িয়ে আসি।

রোকেয়ার ছোট বোন জুলেখা সেখানে ছিল। বলল, দুলাভাই শুধু মেজ আপাকে নিয়ে যাবেন, আমাকে সাথে নেবেন না?

হারুন বলল, কেন নেব না। যাও তোমরা তৈরী হয়ে এস।

বদরপুর থেকে তারা রিক্সায় করে বাকিলাহ বাজার বাসস্ট্যাণ্ডে এল। তারপর প্রায় পনের মাইল বাসে করে এসে চাঁদপুর নামল। হারুন তাদেরকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কিছু মার্কেটিং করল। তারপর তিনজনে একটা হোটেলে ঢুকে হারুন জুলেখাকে বলল, কি খাবে বল।

জুলেখা বলল, আপাকে জিজ্ঞেস করুন।

রোকেয়া বলল, পরোটা ও কাবাবের অর্ডার দাও। পরে কোকাকোলা।

হারুন বলল, দুপুর তো হয়েই গেছে, ভাত খেলে হত না? ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।

রোকেয়া বলল, তাহলে তাই অর্ডার দাও।

হারুন তিন প্লেট বিরানীর অর্ডার দিল। সেই সঙ্গে কাবাবও দিতে বলল। খাওয়ার পর তিনজনে তিনটে কো-কো খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে বাসে উঠল।

তারা যখন বদরপুর ফিরে এল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। হারুন রোকেয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে তার শাশুড়ী বাধা দিয়ে বললেন, আজ আর তোমাদের যেয়ে কাজ নেই; কাল সকালে যেও।

হারুন তার মাকে জানে। আজ না গেলে রোকেয়াকে যা তা করে বলবে। সেই কথা ভেবে বলল, আম্মাকে বলে এসেছি আজ ফিরে যাব। না গেলে খুব চিন্তা করবে।

মেহেরুন্নেসা বললেন,তা হলে খাওয়া দাওয়া করে যাও।

সেদিন খাওয়া দাওয়া করে রাত এগারটায় হারুন রোকেয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

হানুফা বিবি তখন দু'তিনজন জায়ের সাথে গল্প করছিলেন। ছেলে বৌকে ফিরতে দেখে তাদেরকে বললেন, হারুন এই বৌকে নিয়ে ঘর করলে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। অলক্ষুণে মেয়ে হারুনের শরীরটা নষ্ট করে দিয়েছে। কি সুন্দর শরীর ছিল আমার হারুনের। তারপর হারুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোকে আমি বারবার বলছি, এই বৌকে ছেড়ে দে। এই বৌয়ের দ্বারা তোর কোনোদিন সুখ শান্তি হবে না। পেত্নীকে নিয়ে তুই পাগল হলি কেন? যা বলছি তা করছিস না কেন? তুই একে ছেড়ে দিয়ে দেখ, আমি তোর জন্য কত সুন্দর বৌ এনে দিতে পারি কিনা।

হারুন ও রোকেয়া তখন নিজেদের রুমে। রোকেয়া যাতে মায়ের কথা শুনতে না পায়, সে জন্যে তার দু'কানে হারুন নিজের আঙ্গুল দিয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রোকেয়া শাশুড়ীর সব কথা শুনে কেঁদে কেঁদে বলল, ওগো প্রিয়তম, যাতে তোমার সুখ শান্তি হয় তাই কর। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

হারুন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, তুমিও এই কথা বলে আমার মনে ব্যথা দেবে? জেনে রেখ, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ। তুমি আমার দিকে চেয়ে অন্তত সহ্য কর। আল্লাহপাক একদিন না একদিন তার প্রতিফল দেবেন। রোকা তুমি কেঁদ না। তোমার চোখের পানি আমাকে ব্যথা দেয়। যে ক'টাদিন আছি তোমার হাসিমুখ দেখতে চাই। এবার একটু হাস দেখি।

রোকেয়া চোখ মুছে মুছে মৃদু হেসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি তো চলে যাবে, আর আমি এখানে কিভাবে থাকব বলে দাও প্রিয়তম। এই কথা বলে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হারুন তাকে আদর সোহাগে ভরিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি তোমাকে প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেব। তুমিও তার উত্তর দিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক মত পড়বে। প্রতিদন ভোরে উঠে কুরআন তেলাওয়াৎ করবে।সময় করে তাজকেরাতুল আম্বিয়া ও

তাজকেরাতুল আউলিয়া এবং কোরানের তফসির পড়বে। মা ফাতেমা, বিবি রহিমা ও উম্মেহাতুল মোমেনাদের জীবনী পড়বে। ঐ যে দেখছ আলমারী ওতে সব বই আছে। বেহেস্তী জেওর তুমি তো বিয়ের আগে পড়েছ। এখন আবার পড়ো। এই সমস্ত বই যদি পড়, তাহলে সংসারের দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে পারবে না। মনে অনেক শান্তি পাবে। আর খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। রাতে একা বাইরে যাবে না। শরীর খারাপ লাগলে ডাক্তারের কাছে যাবে। আব্বার সেবা যত্ন করো। আম্মা তোমার সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহার করুক না কেন, যা কিছু বলুক না কেন, সেসব মনে রাখবে না। তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে।

সে রাতে তারা ঘুমাল না। সারারাত আনন্দফূর্তি করে কাটাল। এর একদিন পর হারুন ঢাকায় এসে একদিন হোটেলে রইল। তারপরের দিনের ফ্লাইটে দুবাই চলে গেল।

পাঁচ

হারুন বিদেশ চলে যাওয়ার দশ বার দিন পর একদিন রোকেয়ার সেজ দেবর হোসেন কয়েকখানা চিঠি নিয়ে এসে বলল, বড় ভাইয়া দিয়েছে। তারপর একটা চিঠি রোকেয়ার হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমার।

রোকেয়া তখন সংসারের কাজ করছিল। চিঠিটা বুকের কাছে ব্লাউজের ভিতর রেখে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করল। তারপর নিজের রুমে এসে পড়তে শুরু করল।

ওগো আমার হৃদয়ের রানী,

পত্রের প্রারম্ভে তোমাকে জানাই আমার অন্তরের প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা। তারপর তোমার রঙ্গিন গোলাপি ঠোঁটে আমার চুমো দিলাম। এখন রাত একটা। বাইরে ঝিরঝির বাতাস বইছে। ইচ্ছা করছে সেই বাতাসে ভর করে তোমার কাছে চলে যাই। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে তোমাকে পাওয়ার জন্য মনের মধ্যে তুফান বইছে। প্রাণপ্রিয়া রোকা, এই সুদূর বিদেশে আমি নিঃসঙ্গ। তোমার স্মৃতি ও ভালবাসা আমার হৃদয় জুড়ে রয়েছে। প্রতি রাতে ঘুমোবার সময় তোমার মিষ্টি মধুর মুখের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর বুকের উপর চেপে ধরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। আমার প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসে তোমার ভালবাসার গন্ধ পাই। তুমি আমার শরীরের রন্ধে রন্ধে মিশে রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলে থাকতে পারি না। তোমার স্মৃতি আমাকে যেন অতল সাগরে ডুবিয়ে নিয়ে যায়। আবার তোমার ভালবাসা আমাকে সেখান থেকে তুলে এনে সবর করার সবক দেয়। তখন আমার মন শান্তিতে ভরে যায়। তোমাকে ছেড়ে এসে আমার দিন কাটতে চায় না। মনে হয় এক একটা দিন যেন এক একটা মাস। আমি যেমন তোমাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালবাসি, তুমিও তেমনি আমাকে ভালবাস। তাই এত বিরহ ব্যথার মধ্যেও বিশ্বজগৎ আমার কাছে পরম রমণীয় ও লোভনীয় বলে মনে হয়। তুমি আমার সার্থক সহধর্মিনী। প্রিয়তমা রোকা, কেমন আছ জানাবে। তুমি যে আমার জীবন মরণের সাথি। দোওয়া করি আল্লাহপাকের দরবারে, "তিনি যেন তোমাকে সব কিছু সহ্য করার শক্তি দেন।" সুখে থাক, ভাল থাক, সুস্থ থাক ও আনন্দে থাক, আল্লাহ পাকের কাছে এই কামনা করে শেষ করছি। তার আগে আর একবার তোমার রঙ্গিন ঠোঁটে চুমো দিলাম। পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনব।

ইতি

তোমারই পাগল হারুন।

রোকেয়া চিঠিটা দু'তিনবার পড়ল। প্রতিবার পড়ার সময় চোখের পানিতে বুক ভাসাল। পড়ে যেন তার তৃপ্তি মিটছে না। যতবার পড়ে ততবার পড়তে ইচ্ছা হয়। তারপর চিঠির উপর অসংখ্যবার চুমো খেয়ে বালিশের তলায় রেখে দিল। এখনি চিঠির উত্তর লেখার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠলেও মনকে শক্ত করে রুম থেকে বেরিয়ে এল। ভাবল, বেশিক্ষণ রুমে থাকলে শাশুড়ী দুনিয়া ফাটিয়ে ফেলবে। রাতে ঘুমোবার আগে লিখবে ভেবে সংসারের কাজে মন দিল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর রোকেয়া স্বামীর চিঠির উত্তর লিখতে বসল।

ওগো আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী,

প্রথমে তোমার পবিত্র কদমে শতকোটি সালাম জানাচ্ছি। তারপর ভালবাসার সন্দেশ পাঠালাম। গ্রহণ করে ধন্য করো। আশাকরি আল্লাহ পাকের রহমতে তুমি ভালো আছ। আমিও তাঁরই করুণায় ভালো আছি। বাড়ির অন্যান্য সব সংবাদ কুশল জানিবে।

প্রিয়তম, তোমার চিঠি পড়ে যে কত আনন্দ, কত সুখ ও শান্তি পেলাম, তা আল্লাহ পাক জানেন। আমার কলমের অত শক্তি কি আছে যে তোমাকে তা লিখে জানাব? চিঠির মধ্যে যে এত মধু থাকে তা আগে কোনোদিন জানতাম না। চিঠি পড়ার সময় অনাবিল এক খুশির আমেজে সমস্ত তনুমন শিউরে উঠেছে। ওগো জীবন সর্বস্ব, তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কোনো সীমা নেই। হৃদয় উজাড় করে তোমাকে ভালবেসেছি। বাপের বাড়ির অনাদৃত ফুল আর আমি নই। তোমার হাতে আল্লাহ পাকের ইশারায় আমি দলিত ও মথিত হয়েছি। আমি বড় ভাগ্যবতী মেয়ে। তোমার মত স্বামী পেয়ে আমি ধন্য। সত্যি প্রিয়তম, তোমাকে একদণ্ড ভুলে থাকা আমার পক্ষে কোনোকালেও সম্ভব নয়। অতীতের মধুময় সময়গুলোর কথা মনে পড়লে একদিকে যেমন খুব আনন্দ পাই, অপরদিকে তেমনি দুঃখে ও বেদনায় মনটা কেঁদে উঠে। যে স্বামীর সঙ্গে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছি। সে আজ কোথায় কোন সুদূর বিদেশে। আবার কবে সেই মধুময় দিন ফিরে আসবে তা আল্লাহপাককে মালুম। প্রিয়তম, ঘন ঘন চিঠি দিয়ে এই তাপতীর প্রাণ শীতল করো। একা একা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। একটা দুঃখ ও শূন্যতা আমাকে সব সময় গ্রাস করে রেখেছে। লক্ষীটি বল, কেন তুমি আমাকে এভাবে একা ফেরে গেলে? বিদেশের মায়ায় আমাকে ভুলে আছ কি করে?

মনের অস্থিরতায় ও আবেগে এবং বিরহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেক কিছু লিখে তোমার কাছে হয়তো অপরাধী হয়ে গেলাম। স্ত্রী মনে করে স্বামীগুণে ক্ষমা করে দিও। আল্লাহপাকের কাছে তোমার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে এবং পরিশেষে তোমার পুরুষ্ট ওষ্ঠে কয়েকটা কিস দিয়ে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

তোমার পাগলী রোকা।

হারুন বিদেশ যাওয়ার আগে বেশ কয়েকটি এয়ারমেল খাম টিকিটসহ কিনে ঠিকানা লিখে রোকেয়ার হাতে দিয়ে বলেছিল, আমাকে চিঠি দিতে তোমার যেন কোনোরকম অসুবিধে না হয়, সেই জন্যে নিয়ে এলাম। রোকেয়া সেগুলো নিজের বাক্সে রেখে দিয়েছিল। রাত্রে চিঠি লিখে পরের দিন হোসেনকে দিয়ে পোস্ট করাল।

হারুন বিদেশ চলে যাওয়ার দু'মাস পর একদিন রোকেয়ার এক চাচি শাশুড়ী রোকেয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, বৌমা তুমি কি পোয়াতী?

রোকেয়া লজ্জা পেয়ে কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

উনি আরো দু'তিনবার জিজ্ঞেস করার পরও রোকেয়া লজ্জায় বলতে পারল না।

তখন উনি বললেন, বৌমা, তুমি যদি কিছু না বল, তাহলে আমরা বুঝব এই সন্তান হারুনের নয়।

এই কথা শুনে রোকেয়ার জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হারুন জানে?

রোকেয়া আবার মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ জানে।

উনি বললেন, তোমার শাশুড়ী আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল; তাই করলাম। আমার উপর তুমি যেন আবার মনে কষ্ট নিও না। এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

রোকেয়া বসে বসে চোখের পানি ফেলতে লাগল। এতদিনে সে বুঝতে পারল, একমাত্র শাশুড়ী ছাড়া এ বাড়ির সবাই তাকে ভালবাসে। দেবররাও তাকে ভালবাসে। মেজ দেবর শামসু বড় ভাইয়ের বিয়ের সময় দেশে ছিল না। বড় ভাই বিয়ে করেছে জেনে ভাবিকে আলাদা করে চিঠি দিয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু টাকাও ভাবির নামে পাঠিয়েছে। অন্যান্য দেবররা ভাবিকে এটা সেটা কিনে দেয়। রোকেয়ার নানা শ্বশুর আনসার উদ্দিন প্রতি সপ্তাহে একবার নাত বৌকে দেখতে আসেন। সে গর্ভবতী হয়েছে জানার পর কোনোবারে চাটনি, আবার কোনোবারে আচার কিনে নিয়ে আসেন। কোনো সময় এসে যদি দেখেন রোকেয়া বাপের বাড়ি গেছে, তাহলে তিনি রোকেয়াকে দেখতে সেখানে যান। একবার রোকেয়া বাপের বাড়ি থেকে নানার বাড়িতে বেড়াতে গেল।

আনসার উদ্দিন মেয়ের বাড়িতে এসে শুনলেন, রোকেয়া বাপের বাড়িতে গেছে। তখন তিনি সেখানে গেলেন।

রোকেয়ার ছোট বোন জুলেখা পান সরবত দিয়ে বলল, মেজ আপাতো এখানে নেই; নানার বাড়ি গেছে।

আনসার উদ্দিন রসিকতা করে বললেন, সে গেছে তো কি হয়েছে, আমি তাকে নিতে আসি নাই; তোমাকে নিতে এসেছি।

জুলেখা ওঁর রসিকতা বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

আনসার উদ্দিন হাসতে হাসতে রোকেয়ার আব্বা শাহেদ আলীকে বললেন, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ, আমার কথায় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তারপর তিনি রোকেয়ার নানার বাড়িতে গেলেন।

তাকে দেখে রোকেয়া ও তার নানার বাড়ির সবাই অবাক। রোকেয়া সালাম দিয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, নানাভাই কেমন আছেন? নানি কেমন আছেন? তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসলেন না কেন?

আনসার উদ্দিন সালামের উত্তর দিয়ে দো'য়া করে বললেন, আমরা সবাই ভালো আছি। আর তোমার নানিকে নিয়ে আসার কথা যে বললে, সে কেন আসবে? সে মেয়ে মানুষ, আর তুমিও মেয়ে মানুষ। তেমাকে দেখে সে ইন্টারেস্ট পাবে না। তুমি নাত-জামাই হলে অন্য কথা ছিল।

রোকেয়ার মামাতো বোন মনোয়ারা বলল, আপনি তাহলে নাত-বৌকে দেখে ইন্টারেস্ট উপভোগ করতে এসেছেন?

এই কথায় সবাই হাসতে লাগল। আনসার উদ্দিন হাসতে হাসতে বললেন, তোমার পরিচয়টা পেলে উত্তর দিতে সুবিধে হত।

রোকেয়া বলল, ও মনোয়ারা, আমার মামাতো বোন।

আনসার উদ্দিন একবার মনোয়ারার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, অপূর্ব।

রোকেয়া বলল, কি অপূর্ব?

আনসার উদ্দিন বললেন, কি অপূর্ব, তা তোমার বোঝা উচিত ছিল। যখন বুঝতে পারছ না তখন আমিই বলি, মনোয়ারা বিবিকে দেখে তোমার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট চলে গেল। এবার থেকে ওকেই দেখতে আসব।

উনার কথা শুনে আবার সবাই হাসতে লাগল। মনোারা হাসি থামিয়ে বলল, "বেল পাকলে কাকের কি?"

আনসার উদ্দিন বললেন, তোমার কথা অবশ্য ঠিক। তবে ঐ যে লোকে বলে, "খাওয়ার চেয়ে দেখা ভালো।" তারপর রোকেয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি ভাই আবার মনে কষ্ট নিও না। তুমিও অপূর্ব। তোমাদের দু'জনকে দেখে সমান ইন্টারেস্ট পাচ্ছি। এখন বল, হারুন তোমাকে বেশি ভালবাসে, না আমি তোমাকে বেশি ভালবাসি? আর আমাদের দু'জনের মধ্যে কাকে তুমি বেশি ভালবাস?

রোকেয়া হাসতে হাসতে বলল, আপনারা দু'জনে আমাকে যেমন সমান সমান ভালবাসেন তেমনি আমিও আপনাদের ভালবাসি।

আনসার উদ্দিন বললেন, উঁহু, উত্তরটা ঠিক হল না। আমি বেশি ভালবাসি। তাই এই বুড়ো বয়সে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে হারুনদের বাড়িতে দেখতে যাই। আজ সেখানে না পেয়ে তোমার বাপের বাড়িতে এসেছিলাম। সেখানেও না পেয়ে এখানে অনেক কষ্ট ভোগ করে এসেছি। আর হারুন তো সেই যে গেল এতদিনের মধ্যে একদিনও এল না।

রোকেয়া হাসি চেপে রেখে বলল, আসবার রাস্তা থাকলে প্রতিদিন আসত।

আনসার উদ্দিন হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা আজকালের মেয়ে। তোমাদের সাথে কি আর যুক্তি তর্কে পারব ভাই।

নাস্তা খেয়ে তিনি চলে আসতে চাইলে, রোকেয়া ছাড়ল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে বিকেলে চা খাইয়ে তবে ছাড়ল।

শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের ভালবাসা পেয়ে রোকেয়া শাশুড়ীর শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভুলে যায়। তার উপর হারুন প্রতি মাসে তিন-চারখানা করে চিঠি দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এতকিছু সত্ত্বেও রোকেয়ার এমন দিন কাটেনি, যেদিন সে শাশুড়ীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খেয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়নি। হানুফা বিবি বৌয়ের সঙ্গে মিষ্টি মুখে কথা বলা তো দূরের কথা, নরম মেজাজে ও বললেন না। সব সময় রুক্ষ মেজাজে বলেন।

রোকেয়ার বড় ভাই জাভেদ এক বছর পর বিদেশ থেকে এসে রোকেয়াকে নায়ারে নিয়ে এল। রোকেয়ার বিয়ের সময় সে দেশে ছিল না।

রোকেয়া মা বাবাকে সালাম করে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

মেহেরুন্নেসা মায়ের মুখে বিয়ের দিনের রোকেয়ার শাশুড়ীর ব্যবহারের কথা শুনেছিলেন। এখন মেয়েকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোর শাশুড়ী কি তোর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে?

রোকেয়া ভাবল, সত্য কথা বললে মা-বাবা মনে খুব ব্যথা পাবে। কান্না থামিয়ে চোখ মুখ মুছে বলল, না মা, তিনি তেমন কিছু বলেন না। তোমাদের জন্য প্রাণ জ্বলছিল তাই।

রোকেয়ার নানি রহিমন বিবি দু'দিন হল মেয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। তিনি এতক্ষণ সেখানে ছিলেন না। এই মাত্র এলেন। রোকেয়া তাকে সালাম করতে দো'য়া করে বললেন, তুই যে বললি, তোর শ্বাশুড়ী তোকে কিছু বলে না, কথাটা কি ঠিক? তুই না বললেও আমরা জানি। বিয়ের দিনে তোর শাশুড়ী যে কষ্ট দিয়েছে এবং যেসব কথা বলেছে, তাতেই বুঝেছি সে কি রকম মেয়ে। সেই দিনই বুঝতে পেরেছি তোকে চিরকাল অশান্তি ভোগ করতে হবে। তারপর মেয়ে জামাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমিও তোমার শ্বশুর আজিজের কথায় এই কাজ করে খুব অন্যায় করেছি। আর তাকেই বা দোষ দেব কি? সে তো আর হারুনের মায়ের স্বভাব জানত না, হারুনকে জানত। তবে হারুন খুব ভালো। সে দেশে থাকলে আলাদা কথা ছিল। ওর শাশুড়ী খুব জঘন্য ধরনের মেয়ে। তার মত মেয়ে আমি আর দেখিনি।

শাহেদ আলী বললেন, কি আর করার আছে আম্মা। লোকে যে বলে, "জাতের সাপ গর্তে মজে, আর অজাতের সাপ ছোবল মারে।" রোকেয়ার শাশুড়ীর কথা শুনে তার প্রমাণ পেলাম। তারপর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শোন মা রোকেয়া, তোর শাশুড়ী তোর সাথে যতই খারাপ ব্যবহার করুক না কেন, কোনোদিন তার কথার উত্তর করবি না। আর রাগ করেও থাকবি না। নিজের মায়ের মত মনে করবি।

মেহেরুন্নেসা মেয়েকে এক সময় কাছে বসিয়ে বুঝিয়ে বললেন, তোর শাশুড়ী তোর উপর যতই অত্যাচার করুক, তবু তুই রা করবি না। ছোটলোকের মেয়ের মত তার সাথে ঝগড়া করে বাপ-দাদার মুখে চুন-কালি দিবি না। জেনে রাখ মা, মানুষ মাটির উপর কত অত্যাচার করে, কাটে, পিটায়, বাড়িঘর করার সময় কত কিছু করে। তবু মাটি কোনো প্রতিবাদ করে বলে না, কেন তোমরা আমার উপর এত অত্যাচার করছ? কেন বলতে পারে না জানিস? তার কথা বলার মুখ নেই বলে। তেমনি তুইও মাটির মত থাকবি।

রোকেয়া বলল, দো'য়া কর আম্মা, আমি যেন তোমাদের উপদেশ মেনে চলতে পারি। তোমরা আমার শাশুড়ীর কথা যাই শুনে থাক না কেন, তবু আল্লাহ আমাকে অনেক সুখে রেখেছেন। আমার শ্বশুর বাড়ির সব আত্মীয়-স্বজন আমাকে ভালবাসে। শুধু আমার শাশুড়ী আমাকে দেখতে পারে না। সবাইয়ের থেকে আমার নানা শ্বশুর আমাকে বেশি ভালবাসেন। মাঝে মাঝে উনি আমাকে ওঁদের বাড়িতে নিয়ে যান।

মেহেরুন্নেসা বললেন, দো'য়া করি মা, আল্লাহ তোকে সুখী করুক।

রোকেয়ার বান্ধবী লাকি রোকেয়া এসেছে শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। রোকেয়াকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, তোর সাথে অনেক দিন পর দেখা হল। সত্যি তোর জন্য এতদিন আমার মন জ্বলছিল।

রোকেয়া বলল, লাকি, তুই আমাকে দেখে অভিনয় করছিস। যদি প্রাণ জ্বলত, তাহলে নিশ্চয় আমাকে দেখতে যেতিস। স্কুলে যাস, অথচ আমাদের বাড়িতে যাস না। স্কুল থেকে আমাদের বাড়ি মাত্র পনের বিশ মিনিটের রাস্তা।

লাকি বলল, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর, যেতে খুব মন চায়। শুধু তোর বরের কথা চিন্তা করে যাইনি। তাছাড়া পরীক্ষার পর স্কুলে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

স্কুলে যাওয়া না হয় শেষ হয়েছে। কিন্তু আমার বরের কথা বললি কেন? সে কি তোকে খেয়ে ফেলত?

আহা তা কেন, ঐ যে বিয়ের আগে তোর সঙ্গে যে সব কথা বলেছিলাম, সে সব তুই যদি তোর বরকে বলে থাকিস? তাই লজ্জায় যেতে পারি নি।

রোকেয়া হেসে উঠে বলল, সেসব কথা বুঝি বরকে বলা যায়? ঐ যে লোকে বলে, "চোরের মন পুলিশ পুলিশ।" দেখছি তোর মনও তাই।

লাকিও হাসতে হাসতে বলল, তোর বরটা কেমন বলবি?

আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় মনের মত পেয়েছি। তবু খুব ভয় ভয় করে। কি করে ঐ বাড়িতে আজীবন কাটাব।

ভয় করবে কেন? মনের মত যখন স্বামী পেয়েছিস তখন আর চিন্তা কিসের?

তোর কথা ঠিক; কিন্তু আমার শাশুড়ী বড় কঠিন মেয়ে। তার মনে এতটুকু দয়া মায়া নেই। আর বিবেক বিবেচনা বলতেও এতটুকু নেই। দো'য়া করিস, আল্লাহ যেন শাশুড়ীর বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেন।

তাতো করবই। আচ্ছা রুকু, তোর দেবররা কেমন? তারা তোকে ভালবাসে?

রোকেয়া কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বলল, হ্যাঁ তারা আমাকে খুব ভালবাসে। আমার মেজ দেবর বিদেশে থাকে। আমাকে চিঠি দেয়। টাকাও পাঠায়। তুই যদি রাজি থাকিস, তাহলে বল, তার সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করি। আমরা দু'জনে অনেক আগে সেই রকম তো ওয়াদা করেছিলাম।

লাকি বলল, তা করেছিলাম। কিন্তু তোর মেজ দেবর ভালো হলে কি হবে, তোর শাশুড়ীর কথা আমরা যা শুনেছি এবং তুইও যা বললি, তাতে করে সেই ওয়াদা রক্ষা করতে পারব না। জেনেশুনে কেউ আগুনে হাত দেয়? আচ্ছা, তোর শাশুড়ী যে তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, হারুন ভাই জানে না?

রোকেয়া বলল, জানবে না কেন? সে কি তার মাকে চিনে না? তবে শাশুড়ীর দুর্ব্যবহারের সব কথা আমি তাকে জানাই না। আমাকে কাঁদতে দেখলে অথবা আমার মন খারাপ দেখলে যখন জিজ্ঞেস করে তখন অল্পকিছু হলেও বলতে হয়। কারণ সে ঘরে এলেই তার মা তাকে আমার নামে মিথ্যে করে নানান কথা বলে। সেই সময় জিজ্ঞেস করলে আমি সত্য ঘটনা বলি। তখন সে আমাকে বুঝিয়ে বলে, "কি করব বল, হাজার হোক মা তো? তোমার হয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া করলে লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। সবকিছু সহ্য করে যাও। আল্লাহ একদিন না একদিন তার ফল দেবেন। তিনি কোরানপাকে বাবা মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

লাকি বলল, হারুন ভাই অবশ্য ঠিক কথা বলেছে। দো'য়া করি, আল্লাহ তোকে শাশুড়ীর অত্যাচার তেকে রেহাই দিক, সবকিছু সবর করার ক্ষমতা দিক। তারপর বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় বলল, পরে আবার আসব। তুইও যাস।

দিন পনের পর রোকেয়ার সেজ দেবর হোসেন এসে রোকেয়াকে নিয়ে গেল। কয়েকদিন পরে আনসার উদ্দিন মেয়ের বাড়ি এলেন।

রোকেয়া কদমবুসি করে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করল।

আনসার উদ্দিন দো'য়া করে এবং ভালো-মন্দ খবরা-খবর বলে বললেন, আমার মন বলছে, তোমার মেয়ে হবে। আল্লাহ যদি মেয়ে দেন, তাহলে তার নাম রাখবে আশা।

তার কথা শুনে রোকেয়া ও সেখানে যারা ছিল, সবাই হাসতে লাগল। হোসেন বলল, নানা, এত নাম থাকতে এই নাম রাখতে বলছেন কেন?

আনসার উদ্দিন বললেন, কেন রাখতে বললাম শোন, আশা যখন বিয়ের লায়েক হবে তখন সব ছেলেরা আশা করবে আশাকে বিয়ে করব, বুঝেছ?

হোসেন হাসতে হাসতে বলল, নানা ভাইয়ের যেমন কথা; আশা নাম রাখলেই শুধু আশা করবে, আর অন্য নাম রাখলে করবে না বুঝি?

আনসার উদ্দিন বললেন, তুমি এখন ছোট। তাই আমার কথার মানে বুঝতে পারছ না। বড় হলে ঠিকই বুঝবে। এখন শুধু এটুকু বলছি, ঐ নাম রাখলে বেশি আগ্রহী হবে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নানার সঙ্গে গল্প গুজব করে সবাই ঘুমাল। পরের দিন ফজরের সময় সবাই উঠে নামায পড়ল। হোসেন নানাকে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে জাগাবার জন্য গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে বুঝতে পারল, শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, আর হাত পা শিক হয়ে রয়েছে। ভয় পেয়ে মায়ের কাছে গিয়ে সে কথা জানাল।

হানুফা বিবি শুনে তাড়াতাড়ি করে এসে আব্বা আব্বা বলে কয়েকবার ডেকে গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন, মারা গেছেন। তিনি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে লাগলেন। ঐ অলক্ষণে বৌয়ের জন্য এরকম হল। নচেৎ বাবা আমার কাল একদম ভালো ছিল। অনেক দিন কোনো অসুখ-বিসুখ ছিল না। হঠাৎ কি করতে কি হয়ে গেল গো আল্লাহ।

হানুফা বিবির চিৎকারে বাড়ির সবাই সেখানে এল। রোকেয়াকে দেখে হানুফা বিবি বললেন, তুই আমার বাপকে মেরে ফেলেছিস। এক্ষুনি বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে। তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

রোকেয়া নানা শ্বাশুর মারা গেছে শুনে ভীষণ দুঃখ পেয়ে কাঁদছিল। আর ভাবছিল, এ বাড়ির মধ্যে সব থেকে বেশি যিনি আমাকে ভালবাসতেন, তাঁকে আল্লাহপাক তুলে নিলেন। দীলে দীলে তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য দো'য়া করছিল। শ্বাশুড়ীর কথা শুনে আরো বেশি দুঃখ পেয়ে চিন্তা করল, হায়রে মানুষের মূর্খতা? ওঁর পেটে যদি এলেম থাকত, তাহলে এ রকম কথা বলাতো দূরের কথা, এরকম ভাবতেও পারতেন না। তখন তার একটা হাদিসের কথা মনে পড়ল, "তালিবুল এলেম ফরিদাতুন আলা কুল্লে মুসলিমিন" অর্থাৎ মুসলমান নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন ফরয।

ততক্ষণে খবর পেয়ে আশেপাশের বাড়ির মেয়ে পুরুষ অনেকে এসেছে তারা হানুফা বিবির কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে ওঁর এক চাচাতো বড় জা বললেন, হারুনের মা, তুমি একি কথা বলছ?ইনার মৃত্যু আল্লাহপাকের হুকুমে হয়েছে। তুমি শুধু শুধু বৌকে দোষারূপ করছ? কারুর মৃত্যুর জন্য কাউকে এভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। যখন দু'চারজন এসব বলতে নিষেধ করল তখন বৌকে দোষারূপ করা থেকে বিরত হলেন।

আনসার উদ্দিন মারা যাওয়ার ষোল সতের দিন পর রোকেয়া একটা মেয়ে প্রসব করল। বাড়ির সবাই খুশি হয়ে বলাবলি করতে লাগল, এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর পর আল্লাহ মেয়ে দিল। আমাদের বাড়িতে কোনো মেয়ে ছিল না যে, একটু আদর করব। কিন্তু হানুফা বিবি খুশি হতে পারলেন না। বললেন, এতদিন মেয়ে হয়নি ভালই ছিল। মেয়ে বিয়ে দিতে যখন মোটা টাকা খরচ হবে তখন কত ধানে কত চাল বুঝবে। ওঁর কথার কেউ কান দিল না।

আকিকার দিন সবাই নাম রাখল রুকসানা বেগম।

রুকসানা যখন দু'মাসের তখন হারুনের মেজ ভাই শামসু বিদেশ থেকে এল। সে ভাইজী হয়েছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হল।

রোকেয়াকে দেখে এবং তার ব্যবহারে শামসু খুব সন্তুষ্ট। তাকে বলল, তোমার মত ভাবি পেয়ে আমি ধন্য। চিঠিতে যখন ভাইয়ার বিয়ের কথা জানতে পারলাম তখন মনে মনে তোমার মতো ভাবিই আশা করেছিলাম।

রোকেয়া বলল, আমিও তোমার মতো দেবর পেয়ে ধন্য হলাম। এখন বলত ভাই, আমি তো তেমন সুন্দরী নই, তবু কেন আমাকে তোমার ভালো লাগল?

শামসু বলল, কে বলেছে তুমি সুন্দরী নও। শুধু গায়ের চামড়া সাদা হলেই কেউ সুন্দরী হয় না। সুন্দরী হওয়ার জন্য সাদা রং ছাড়া আর যেসমস্ত জিনিসগুলো দরকার, তা তোমার মধ্যে বিদ্যমান। তার উপর তোমার গুণাবলী তোমাকে আরো সুন্দরী করে তুলেছে।তাই তো নানাভাই তোমাকে অত ভালবাসতেন। তিনি যে রকম রসিক ছিলেন, তুমিও সেইরূপ রসিক। নানাভাইকে জীবিত দেখতে পেলাম না, এটাই যা দুঃখ। তার মতো রসিক মানুষ জীবনে দেখিনি। তারপর রোকসানাকে আদর করতে করতে বলল, মামণি তুমিও তোমার মায়ের মতো গুণবতী হও, এই দো'য়া করি।

শামসু আসার প্রায় পাঁচ ছ মাস পর হারুন হঠাৎ বিদেশ থেকে এল।

রোকেয়া তখন যোহরের নামায পড়ছিল। নামাযের মধ্যে স্বামীর আগমন টের পেল। নামায শেষ করে রুমে গিয়ে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

হারুন সালামের জবাব দিয়ে স্ত্রীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে রইল। তারপর দু'গালে অসংখ্য চুমো খেয়ে বলল, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি সত্যি তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছি কি না?

রোকেয়াও চুমোর প্রতিদান দিয়ে বুকে মাথা রেখে বলল, হ্যাঁ গো সত্যি। নামায পড়ার সময় তোমার আসার খবর টের পেয়ে দু'রাকায়াত শোকরানার নামায পড়েছি। তুমি একটু ছাড়, রোকসানাকে নিয়ে আসি।

হারুন তাকে আবার কয়েকটা চুমো খেয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, যাও তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

রোকেয়া রুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দোলনা তেকে ঘুমন্ত রোকসানাকে নিয়ে ফিরে এল। তারপর স্বামীর কোলে দেওয়ার সময় বলল, এই নাও তোমার মেয়ে রোকসানা। আল্লাহপাক আমার মনের বাসনা পূরণ করে মেয়ে দিয়েছেন। সে জন্যে তাঁর পাক দরবারে শুকরিয়া জানিয়েছি।

হারুন মেয়েকে চুমো খেয়ে আদর করতে করতে বলল, রোকা, তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে। তবে হেরে গিয়েও খুব আনন্দ লাগছে। কারণ আমাদের বাড়িতে কোনো ছিল না।

রোকসানা জেগে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে দিল। এক বছরের মেয়ে কিছু বলতে পারছে না। এক সময় আম্মু বলে রোকেয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভ্যা করে কেঁদে উঠল।

রোকেয়া কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, কাঁদছ কেন আম্মু, তোমার আব্বুকে চিনতে পারছ না? রোকসানার কান্না থেমে যেতে স্বামীকে বলল, চল খেতে চল।

হানুফা বিবি প্রথম থেকেই ছেলে বৌকে এক সাথে বেশিক্ষণ থাকা পছন্দ করেন না। তাই হারুন ঘরে থাকলে রোকেয়া যখন কাছে আসত তখন বড় গলায় বলতে থাকেন, দিনের বেলা স্বামী ঘরে এলেই তার কাছে যেতে হবে নাকি? এমন নির্লজ্জ মেয়ে কখনো দেখিনি। এদিকে সংসারের কাজ ওল ওল, ভ্যান ভ্যান করছে। সে সব করবে কে?

প্রথম প্রথম রোকেয়া এই কথা শুনে লজ্জায় বাঁচত না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। পরে দিনের বেলা হারুন ঘরে থাকলে হঠাতে আসত না।

একদিন হানুফা বিবি রোকেয়াকে বললেন, তুই সকালে গোসল করতে এইদিক দিয়ে যাবি না। তোর নাপাক দৃষ্টি আমার ছেলেদের উপর পড়ে। তাই তাদের অসুখ লেগেই থাকে। তোকে এনে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। তুই অপয়া সর্বনাশী মেয়ে।

রোকেয়া শুনে লজ্জা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

হারুন বাড়িতে আসার কয়েক দিন পর একদিন মাকে বলল, আজ তোমাদের বৌকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব।

হানুফা বিবি রেগে গিয়ে বললেন, তাহলে সংসারের কাজ করবে কে? আমাকে কি তোরা বাঁদী পেয়েছিস নাকি? আমি কোনো কাজ করতে পারব না।

হারুন বলল, তুমি এমন কথা বলছ কেন আম্মা? তুমি কাজ করতে যাবে কেন? তোমাদের বৌ সব কাজ করে দিয়ে যাবে।

হানুফা বিবি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

হারুন রোকেয়াকে বলল, তুমি চটপট সব কাজ সেরে ফেলে তৈরি হয়ে নাও, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি।

রোকেয়া তখন চিন্তা করল, বেড়াতে না যাওয়াই ভালো। গেলে শাশুড়ী আজ আবার অনেক কথা শোনাবে। আবার ভাবল, স্বামীর কথা না শুনলে সে মনে কষ্ট পাবে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে হারুন বলল, রোকা, তুমি আমার কথা শুনবে না?

রোকেয়া চিন্তা করে ঠিক করল, শাশুড়ীর বকুনি খাবে সেও ভালো, তবু স্বামীর মনে কষ্ট দেবে না। বলল, ঠিক আছে, তুমি কোথায় যাবে বলছিলে যাও। আমি ততক্ষণে কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

সেদিন হারুন একটা স্কুটার ভাড়া করে রোকেয়াকে নিয়ে প্রথমে বদরপুরে শ্বশুর বাড়ি গেল। শ্বশুর শাশুড়ীকে সালাম করে কুশল বিনিময় করল। তারপর নাস্তাপানি খেয়ে ছোট শালা বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদপুর টাউনে এল। মার্কেট ঘুরে ঘুরে হারুন মায়ের ও স্ত্রী জন্য দুটো শাড়ী ও দুটো ব্লাউজ এবং দু'জোড়া জুতো, আব্বার জন্য একটা লুঙ্গী ও পাঞ্জাবী, রোকসানার দু'সেট জামা ও জুতো, ছোট ভাইদের ও বাহাদুরের জন্যে একটা করে প্যান্ট ও শার্টের পীস এবং জুলেখার জন্য থ্রিও পীস কিনল। তারপর ভাত খাওয়ার জন্য একটা হোটেলে ঢুকল।

খাওয়ার শেষ পর্যায়ে বাহাদুর বলল, দুলাভাই, আইসক্রীম খাওয়াতে হবে। হারুন মেসিয়ারকে ডেকে চারটে পোলার দিতে বলল।

রোকেয়া মেসিয়ারকে উদ্দেশ্য করে বলল, না না তিনটে দিন। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, চারটে কি হবে? রোকসানা আইসক্রীম খেতে পারবে না। যদি খায় আমার থেকে খাওয়াব।

খাওয়া-দাওয়ার পর তারা বাড়ি রওয়ানা দিল। ফেরার পথে প্রথমে শ্বশুর বাড়িতে এল। জুলেখা থ্রিপীস দেখে মহাখুশী। মেহেরুন্নেসা মেয়ে জামাইকে থেকে যেতে বললেন।

হারুন ও রোকেয়া কিছুতেই রাজি হল না।

মেহেরুন্নেসা বললেন, তাহলে রাতে খাওয়া-দাওয়া করে যাও।

রোকেয়া জানে, এমনি শাশুড়ীতে আসতে দিতে চেয়েছিল না। তার উপর রাত করে বাড়ি ফিরলে কিছু বলতে বাকি রাখবে না। সেই কথা ভেবে বলল, না আম্মা, আমাদেরকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। তারপর মিথ্যে করে বলল, তোমার জামাইয়ের কাছে আজ সন্ধ্যের সময় কয়েকজন লোক দেখা করতে আসবে।

মেহেরুন্নেসা বললেন, তাহলে তোদেরকে তো আটকাতে পারি না। তারপর জামাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা একটু জিরিয়ে নাও। আমি নাস্তা তৈরি করে নিয়ে আসি।

নাস্তা খেয়ে তারা যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যে।

হানুফা বিবি তোদেরকে দেখে চিৎকার করে হারুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাকে বাঁদীগিরী করতে দিয়ে বৌ নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে ফুর্তি আমোদ করে এলি। আল্লাহ-এর বিচার করবে।

হারুন মায়ের কথায় রাগ করল না। মাকে খুশি কারার জন্য বলল, আম্মা, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। সংসারে কাজ করলে কেউ বাঁদী হয় না। বরং বাঁদীগিরী করার জন্য রোকেয়াকে বিয়ে করে এনেছি। তারপর মায়ের হাত ধরে ঘরে এনে তার, আব্বার ও ভাইদের কাপড়-চোপড় ও জুতো যা কিছু কিনে এনেছে, সেগুলোর প্যাকেট হাতে দিয়ে বলল, দেখ দেখি এগুলো তোমার পছন্দ হয় কি না?

হানুফা বিবি একটা একটা সবগুলো দেখে খুশি হলেন। বললেন, রোকসানা ও তার মায়ের জন্য কিছু কিনিসনি?

হারুন বলল, হ্যা কিনেছি। তারপর সেগুলোও খুলে দেখাল।

হানুফা বিবি আর কিছু না বলে কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে গেলেন।

এইভাবে চার পাঁচ মাস পার হয়ে গেল। এবার হারুন বিদেশ চলে যাবে। তাই একদিন রোকেয়াকে বলল, আজ বেড়াতে যাব। তুমি ঘরের সব কাজ এমন ভাবে-করে ফেলবে, আম্মা যেন কিছু বলতে না পারে।

রোকেয়া সংসারে সব কাজ ঠিকমত করে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হল। হানুফা বিবি তা জানতে পেরে ভীষণ মুখ খারাপ করে গালাগালি করতে করতে বললেন, এমন ছোটলোকের মেয়ে জীবনে দেখিনি। লজ্জা শরম বলতে কিছু নেই। স্বামীকে যাদু করে চুষে খেয়ে ফেলতে চায়। তাকে ভেড়া বানিয়ে বাইরে নিয়ে ফূর্তি করে। ঘরে ফূর্তি করে পোষায় না। হস্তিনী মেয়েরা এই রকম হয়। এই মেয়ে আমার ছেলেকে শেষ না করে ছাড়বে না। এ রকম যে করবে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তখন বৌ করতে অমত করে ছিলাম। এখন আমার ঘাড়ে সংসারের কাজ ফেলে দিয়ে স্বামীকে নিয়ে নবাবের বেটী ফূর্তি করতে বেরোচ্ছে।

হানুফা বিবি যখন এইসব বলছিলেন তখন হারুন ও রোকেয়া নিজেদের রুমে ছিল। রোকেয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, প্রিয়তম তুমি রাগ করো না, আজ আমি বেড়াতে যাব না।

হারুন এতক্ষণ মায়ের কথা শুনে খুব রেগে গিয়েছিল। এতদিন তার অনেক কথা সহ্য করতে পারলেও আজ পারল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আম্মা, তুমি এসব কি শুরু করলে বলতো? রোকেয়াকে কি পেয়েছ? সব সময় এরকম করলে সে এখানে টিকবে কি করে? তুমি যে ওকে এভাবে বলছ, ওতো এখন এ বাড়ির বড় বৌ, এরকম করে বললে আমাদের বংশের ইজ্জত যাবে না?

হানুফা বিবি রাগের সঙ্গে বললেন, তুই বৌয়ের হয়ে এত যে শাউকড়ি করছিস, ঘরের কাজ কে করবে শুনি?

হারুন বলল, তোমাদের শুধু কাজ আর কাজ। সে তো তোমার কথামত সংসারের সব কাজই করে। আজও সব কাজ সেরে দিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বৌ তো যৈতেই চায় না। আমি তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি।

হানুফা বিবি এই কথার জবাব দিতে না পেরে আরো রেগে গিয়ে বললেন, দেখ হারুন, আমাকে বেশি রাগাবি না।যা, যেখানে তোদের মন চায় যা। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

হারুন চুপচাপ ফিরে এসে রোকেয়া ও রোকসানাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল।

বদরুদ্দিন এখন বেশ সুস্থ। তিনি সুস্থ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় ছেলে বৌ কিংবা সংসার নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামান নি। আজ ছেলে বৌ বেড়াতে বেরিয়ে যাবার পর স্ত্রীকে বললেন, ওরা আজকালের ছেলেমেয়ে, একটু আধটু বেড়িয়ে ফুর্তি করবে। তাছাড়া এটাই তো ঐসব করার বয়স। তাতে তুমি বাধা দিতে যাও কেন?

হানুফা বিবি বেশ অবাক হয়ে স্বামীর দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, কি ব্যাপার? তুমিতো কোনোদিন সংসারের কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাওনি। আজ যে হঠাৎ ছেলে বৌয়ের জন্য দরদ উথলে উঠল? ঐ সর্বনাশী মেয়েটা হারুনকে শেষ করে দিচ্ছে। তা দেখতে পাওনি? আমার ছেলের কিছু হলে, আমিও বলে রাখছি, ওকেও আমি শেষ করে দেব। তুমি এসব নিয়ে আর কোনোদিন কথা বলবে না।

বদরুদ্দিন স্ত্রীকে ভালভাবেই চেনেন। সে যে নিজের গঁয়ে চিরকাল চলে এসেছে তা জানেন। বিয়ের পর প্রথম প্রথম স্ত্রীর এই গুঁয়েমীর জন্য মারধর করতেন। তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। হানুফা বিবির গঁ আরো বেড়ে গেছে। তাই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক রাখেন নি। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক তা কোনোদিন ছিল না। আর আজও নেই। হানুফা বিবি নীরেট মুর্খ। তিনি মধুর সম্পর্ক টম্পর্ক কি নিজে যেমন জানেন না, তেমনি অন্য কারোদেরে যে থাকতে পারে তাও জানেন না। তাকে বদরুদ্দিন কোনোদিন কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাননি। তাই ছেলে বৌকে বেড়াতে নিয়ে গেলে রেগে যান। এখন তাদের হয়ে স্বামীকে ঐ কথা বলতে শুনে তিনি তাকে ঐসব বললেন। আর বদরুদ্দিন ও তাই স্ত্রীর কথা শুনে চুপ করে গেলেন।

ছয়

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বদরুদ্দিন আজ মিলাদ পড়াবার আয়োজন করেছেন। মিলাদ শেষ হতে রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তখনো কারো খাওয়া-দাওয়া হয়নি। হঠাৎ রোকেয়া মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

তার ছোট দুটো দেবর দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলল, ভাবি, তোমার কি হয়েছে? অমন করে পড়ে গেল কেন?

রোকেয়া কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বলল, কি জানি, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে যেতে পড়ে গেলাম। তারপর উঠে আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

হানুফা বিবি বৌকে পড়ে যেতে দেখেছেন; কিন্তু কাছে আসেননি। তাকে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, ভাত না খেয়ে ঘুম যাচ্ছিস কেন? সারাদিন তো একটা কাজও করিসনি। তবু ভাত খেতে সময় পেলি না।

রোকেয়া শাশুড়ীর কথা শুনে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ভাবল, সারাদিনএকটু বসবারও সময় পেলাম না, আর উনি বললেন কিনা, একটা কাজও করিনি। তখন তার মনে খুব কষ্ট হল। আজ আর ভাত খাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল। আবার চিন্তা করল, ঘরে অনেক মেহমান, ভাত না খেলে শাশুড়ী আবার হয়তো গালাগালি শুরু করে দেবেন। তাই উঠে এসে ভাত খেল।

পরের দিন সকালে মেহমানরা সব চলে গেলেন। শুধু হারুনের নানি রয়ে গেলেন। রোকেয়া নাস্তা বানিয়ে সবাইকে খেতে দিল।

হারুনের সেজ ভাই মজিদ তার ডিমের সাথে খোসা লেগে রয়েছে দেখে রেগেমেগে রোকেয়াকে বলল, ভাবি, তুমি বাপের বাড়িতে কাজ করতে করতে হাতের চামড়া খুইয়ে ফেলছ, আর এখানে এসে চালতা বেচনি হয়ে দোলনায় চড়েছ।

রোকেয়া অবাক হয়ে বলল, মজিদ ভাই, হঠাৎ তুমি আমাকে একথা বললে কেন?

মজিদ বলল,আহা দুধের বাচ্চা, কিছুই জানে না। তারপর ডিমটা দেখিয়ে বলল, এই যে ডিমের সাথে খোসা লেগে রয়েছে দেখতে পাওনি বুঝি?

রোকেয়া বলল, তুমি না জেনে এ রকম কথা আমাকে বলতে পারলে? ডিম নানি ছাড়িয়েছে।

মজিদ মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেখলে আম্মা, বেটীকে চাঁই দিয়েও ধারা যাচ্ছে না। কেমন কথার কাটান দিচ্ছে? ভাবি দিন দিন মুখরা হয়ে উঠছে।

হানুফা বিবি ঝংকার দিয়ে বলল, হবে না? তোর বড় ভাইয়ের আস্কারা পেয়ে এ রকম হচ্ছে। তারপর রোকেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই বেটী, চুপ করে থাকবি। কথা বললে ঠোঁট সেলাই করে দেব।

এতক্ষণে হারুনের নানি বললেন, তোমরা একি কাণ্ড শুরু করলে? ডিমগুলো আমি পরিষ্কার করেছি। তোমাদের বৌ তখন অন্য কাজ করছিল।

হানুফা বিবি বললেন, আম্মা, তুমি আবার আমাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ কেন? এসব তুমি কিছু বুঝবে না।

হারুন সেখানে নাস্তা খেতে এসেছে। ছোট ভাইয়ের কথা শুনে প্রথমে মনে করেছিল, রোকেয়ার দোষের জন্য ছেলে মানুষি বুদ্ধিতে সে ঐ রকম বলে ফেলেছে। তবু রেগে গিয়েও চুপ করেছিল। তারপর রোকেয়া ডিম ছাড়ইনি বলা সত্ত্বেও মজিদ ও মা যখন রোকেয়াকে ঐ সব বলল, তখন তাদের উপর অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলতে গিয়েও থেমে গেল। চিন্তা করল, কিছু বলতে গেলেই কেলেংকারীর সৃষ্টি হবে। তাই রাগ দমন করার জন্য না খেয়ে রুমে চলে গেল।

সকলের নাস্তা খাওয়া হয়ে যেতে রোকেয়া থালা-বাসন ধুয়ে রেখে রুমে এল। হারুন খায়নি বলে সেও খেল না।

তাকে দেখে হারুন বলল, আমি টিকিট কেটে নিয়ে আসি, আর থাকব না। আমার মন দিন দিন বিষিয়ে উঠছে। এই বলে সে বেরিয়ে যেতে উদ্দত হল।

রোকেয়া তার দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওগো তুমি এখন যেও না। তুমি চলে গেলে আমি বুঝি শান্তি পাব? তুমি কয়েকদিন মাত্র বাড়িতে এসে আম্মার কাছে থাকতে পারছ না। আর আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কি করে তার সঙ্গে কাটাচ্ছি? কেন কাটাচ্ছি শুনবে? শুধু তোমার ভালবাসা পাওয়ার জন্য। তা যদি না পাই, তাহলে আমি বাঁচব কোন আশায়?

হারুন তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যি রোকা, তোমাকে বিয়ে করে আমি মস্ত বড় অন্যায় করেছি। সে কথা ভেবে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

রোকেয়া বলল, তুমি অপরাধী হতে যাবে কেন? তোমার ভালবাসায় কোনো খাদ নেই। সবই আমার তকদির। আমার তকদিরে যা লেখা আছে, তা তুমি শত চেষ্টা করেও দূর করতে পারবে না। আর কখনো নিজেকে অপরাধী ভাববে না বল?

হারুন তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, তোমার কথাই ঠিক। তক্বদিরে যা লেখা থাকে তা, কেউ বদলাতে পারে না।

সেদিন দুপুরেও আম্মার উপর রাগ করে দু'জনে ভাত খেল না।

বিকেলে রোকেয়া ঘরদোর ঝাড়ু দিতে গেলে হানুফা বিবি তার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে বললেন, তোকে আর কাজ করতে হবে না।

রোকেয়া আর কি করবে? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চা-নাস্তা করতে গেল।

হানুফা বিবি ঝাড় দেওয়ার কাজ শেষ করে রান্না ঘরে এসে রোকেয়া এসব নাস্তা বানিয়েছিল, তা উঠোনে ফেলে দিয়ে নিজে বানাতে লাগলেন।

রোকেয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে রুমে এসে বসে রইল।

রাতে রান্না করতে গেলে হানুফা বিবি রাগের সঙ্গে বললেন, তোকে কাজ করতে দিই না, তবু করতে আসিস কেন?

রোকেয়া চিন্তা করল, কথা বললেই শাশুড়ী আরো রেগে যা তা করে বলবে। তাই রুমে এসে শুয়ে শুয়ে কাঁদল।

হারুন ঘরেই আছে। সকাল থেকে সবকিছু দেখছে; কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। ভাবছে, ভালমন্দ কিছু বলতে গেলেই দু'জনকেই আম্মা গালাগালি করবে।

হারুন মসজিদ থেকে মাগরিবের নামায পড়ে এসে স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে বলল, কেঁদে আর কি করবে? কাজ যখন করতে দিচ্ছে না তখন করো না।

রোকেয়া বলল, কাজ না করলে খেতে যাব কোনমুখে?

ঃ তুমি তো ইচ্ছা করে কাজ করা বন্ধ করছ না? আম্মাই তোমাকে করতে দিচ্ছে না।

ঃ তবু কোন মুখে খেতে যাব?

হারুন আর কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল। এশার আযান হতে রোকেয়া নামায পড়ার জন্য অজু করতে গেল।

হারুন নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেল।

রোকেয়া নামাজ পড়ে বিছানায় বসে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগল।

হারুন নামায পড়ে ফিরে এসে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল ভাত খেয়েছ?

ঃ না।

ঃ আম্মা খেতে ডাকেনি?

ঃ না।

হারুন আর কিছু না বলে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে হানুফা বিবি দরজার কাছে এসে বললেন, হারুন ভাত খাবি আয়।

সকাল থেকে রোকেয়া খায়নি বলে হারুন ও খায়নি। সে ইচ্ছে করলে হোটেলে খেতে পারত; কিন্তু রোকেয়াকে না খাইয়ে সেও খেতে পারেনি। আবার রোকেয়ার জন্য হোটেল থেকে খাবার কিনে নিয়ে এলে, মা হুলস্থূল কাণ্ড করবে ভেবে আনেনি। এখন রোকেয়াকে না ডেকে শুধু তাকে খেতে ডাকছে শুনে মায়ের উপর প্রচণ্ড অভিমান হল। তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। সামলে নিয়ে বলল, তোমরা খেয়ে নাও, আমি খাব না।

হানুফা বিবি আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে রোকেয়া কাজ করতে গেলে হানুফা বিবি বললেন, তোকে আর আমার সংসারে কোনো কাজ করতে হবে না।

জোর করে করতে গেলে যদি গালাগালি করেন সে কথা ভেবে রোকেয়া নিজ রুমে এসে বসে বসে প্রচণ্ড ক্ষিধের জ্বালায় চোখের পানি ফেলতে লাগল।

হারুন কিন্তু ঘরে নাস্তা খেল। তারপর বাইরে থেকে রুটি, কলা ও পেপসী কিনে এনে রোকেয়াকে খেতে বলল।

এভাবে এক সপ্তাহ চলল। হারুন ঘরে খাওয়া-দাওয়া করলেও রোকেয়াকে কেউ খেতে ডাকেনি এবং তাকে সংসারের কোনো কাজও করতে দেয়া হয়নি।

এই কদিন রোকেয়া এটা সেটা খেয়ে দিন কাটিয়েছে। আটদিনের দিন হারুন বলল, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। এখানে থাকলে না খেয়ে মরে যাবে। শেষে আমাদের বদনাম হবে।

এই কথা শুনে রোকেয়ার মনে খুব আঘাত লাগল। চোখের পানিতে বুক ভাসাতে ভাসাতে বলল, বেশ তুমি যা চাও তাই হবে।

ঐদিন হারুন একটা স্কুটার এনে রোকেয়াকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

রোকেয়ার মনে হল, এর চেয়ে তার মরণ ভালো ছিল। যেতে যেতে ভাবল, আমি হারুনের জন্য না খেয়ে এতদিন কাটালাম, তার সে কিনা তার কোনো প্রতিকার না করে উল্টো আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল? এই জন্য কথায় বলে, "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।"

বাপের বাড়ি পৌছাতে সকলে রোকেয়ার শরীরের অবস্থা দেখে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

রোকেয়া তাদেরকে তার অসুস্থতার কথা জানাল।

মেহেরুন্নেসা এক সময় মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, আসল ঘটনা কি হয়েছে বলতো।

রোকেয়া মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর শ্বশুর বাড়িতে যা ঘটেছে তা সব খুলে বলল।

মেয়ের কথা শুনে মেহেরুন্নেসা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, করার কিছু নেই। সবর কর মা, একদিন না একদিন আল্লাহ তার ফল দেবেন। জানিস তো, "সবরের গাছ খুব তিতা, কিন্তু ফল খুব মিষ্টি।"

চার পাঁচদিন পর হারুন শ্বশুর বাড়ি এল।

রোকেয়া তাকে কদমবুসি করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

হারুন তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল, সেদিন তুমি হয়তো মনে খুব কষ্ট পেয়েছ। কিন্তু আমি মায়ের বিরুদ্ধে কি করতে পারি বল? তোমাকে পাঠিয়ে দিয়ে এই কদিন আমি যে কিভাবে কাটিয়েছি তা একমাত্র আল্লাহপাক জানেন। তবুও আমার অন্যায় হয়েছে, সে জন্য মাফ চাইছি।

রোকেয়া চোখের পানি মুছে বলল, তোমার আর দোষ কি? সবই আমার কপাল। তুমি আমার কাছে মাফ চেয়ে আমাকে অপরাধী কর না।

হারুন বলল, রোকা, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে না পেরে মাযের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। বল আমার সঙ্গে যাবে?

রোকেয়া বলল, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? বিয়ের পরে মেয়েদের স্বামীইতো সর্বস্ব। বাপ-মাও পর হয়ে যায়। তুমি নিয়ে যেতে এসেছ, আমি যাব না কেন? নিশ্চয় যাব।

বিকেলে হারুন রোকেয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

রোকেয়া ঘরে ঢুকে প্রথমে শ্বশুরকে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, আব্বা কেমন আছেন।

বদরুদ্দিন বউয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, ভালো আছি মা।

তারপর রোকেয়া শ্বশুরের রুম থেকে বেরিয়ে এসে শাশুড়ীকে কদমবুসি করতে গেল।

হানুফা বিবি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে সকাল থেকে রেগে আছেন। রোকেয়া কদমবুসি করতে গেল পা সরিয়ে নিয়ে ঝেঁঝিয়ে উঠে বললেন, আমাকে ছুঁবি না। তোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। তুই এখান থেকে চলে যা।

রোকেয়া মাথা নিচু করে সেখান থেকে নিজের রুমে এসে স্বামীকে মায়ের কথা বলল।

হারুন অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি মায়ের কথায় কিছু মনে করো না।

বিকেলে রোকেয়া রাত্রের জন্য রান্না করতে লাগল।

এদিকে হানুফা বিবি বারান্দায় পাটি বিছিয়ে একদল মেয়ে নিয়ে গল্প করতে বসেছেন। উনার এক জা, যিনি রোকেয়াকে দেখতে গিয়ে অপছন্দ করেছিলেন, তিনি একসময় বলরেন, হারুনের মা, তুমি ঐ বউয়ের হাতের রানা খাও কেমন করে? হারুনকে বলে দিও ওর হাতের রান্না খেলে পাপ হবে।

হানুফা বিবি বললেন, হ্যাঁ তুমি ঠিক কথা বলেছ। হারুন ঘরে এলে আজ তাকে বলব।

উনি আবার বললেন, এই বৌ দিয়ে তোমাদের সুখ শান্তি হবে না। হারুনকে বলো, সে যেন এই বৌকে ছেড়ে দেয়। কারণ সে তোমাদেরকে পছন্দ করে না। তোমাদের এত লোকেরা ঝামেলা ও সহ্য করতে পারছে না। সে যদি একমাত্র ছেলের বৌ হত তাহলে রান্না বান্নাও করত না। হোটেল থেকে কিনে এনে খেত।

রোকেয়া তাদের এইসব কথা শুনতে শুনতে রান্নার কাজ শেষ করল। তারপর পাশের বাড়ির এক চাচাতো জায়ের কাছে গিয়ে বসল। এই জায়ের সঙ্গে রোকেয়ার একটু ভাবসাব। মাঝে মধ্যেতার কাছে গিয়ে গল্প গুজব করে।

কিছুক্ষণ পরে হারুনকে ঘরে আসতে দেখে হানুফা বিবি চুলোয় কাঠ গুঁজে দিয়ে ধোঁয়া করে এসে তাকে বললেন। এবার তুই নিজের চোখে দেখ, তোর বৌ আগুনে ধোঁয়া দিয়ে চলে গেছে, ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবে বলে। আমি কত করে তাকে বললাম, আমাদেরকে একটু চা করে দিতে। আমার কথার কোনো দাম দিল না। ওদের ঘরে গিয়ে গল্প করছে।

হারুন মায়ের কথা শুনে রোকেয়ার উপর খুব রেগে গেল। তার কাছে গিয়ে বলল, তোমার জন্য আমি এত কথা শুনি কেন? তুমি ঘরে আগুন লাগাবে বলে চুলোয় কাঠ দিয়ে এসে এখানে গল্প করছ?

রোকেয়া বলল, একথা তুমি বিশ্বাস করলে? তারপর তার শাশুড়ী ও চাচি শাশুড়ী যা বলেছিলেন সব হারুনকে বলল।

হারুন বলল, ঠিক আছে তুমি ঘরে চল।

রোকেয়া ঘরে এলে হানুফা বিবি বললেন, তোকে কত করে বললাম একটু চা করে দিতে। তুই দেমাগ করে চুলোয় ধোঁয়া দিয়ে চলে গেলি।

এই কথা শুনে রোকেয়া কান্নামান্না হয়ে বলল, আম্মা, আপনারা সবাই আমাকে নিয়ে যা তা করে বলছিলেন বলে আমি না শোনার জন্য চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু চুলোয় ধোঁয়া দিয়ে যাইনি। কারণ রান্না তো শেষ। আর আপনি চা দিতেও বলেননি। এটা একেবারে মিথ্যে কথা।

হানুফা বিবি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বললেন, কি আমি মিথ্যে বলেছি? তোর এতবড় সাহস? তারপর হারুনকে বললেন, কিরে তোর সামনে আমাকে মিথ্যেবাদী বলল অথচ তুই চুপ করে আছিস? এই ধরনের মেয়েকে রীতিমতো পিটালে তবে সোজা হবে।

হারুন আসল ঘটনা বুঝতে পেরে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল।

হানুফা বিবি সেই জাকে বললেন, দেখছ বুবু, হারুন কিছু বলল না। বলবে কি করে? ডাইনীটা আমার ছেলেকে তাবিজ করেছে। তা না হলে ছেলে হয়ে মায়ের অপমান সহ্য করে?

এর কয়েকদিন পর হারুন বিদেশ চলে যাবে। তাই একদিন সে রোকেয়াকে নিয়ে তার বাপের বাড়িতে সকলের সঙ্গে দেখা করতে এল। সেখানে একবেলা থেকে খাওয়া দাওয়া করে হারুন সবাইকে বিদেশ যাওয়ার কথা বলে রোকেয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই হানুফা বিবি হারুনকে বললেন, তোকে কতবার বলেছি এই বৌকে নিয়ে কোনোদিন সুখ শান্তি পানি না। তুই এই একখানা বৌ নিয়ে এত পাগল হলি কেন? আবার বলছি ওকে ছেড়ে দে। আমি এর চেয়ে সুন্দর সুন্দর দশখানা বৌ তোকে এনে দেব।

রোকেয়া শাশুড়ীর কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে হারুনকে বলল, এই সংসারে আমার সুখ শান্তি কোনোদিন হবে না। জানি না কপালে কি আছে?

হারুন তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, আম্মা যা কিছু বলুক না কেন, আমি তুমি ঠিক থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না। একথা আগেও অনেকবার বলেছি। এখন আবার তাই বলছি।

রোকেয়া বলল, আমি আমার সুখ শান্তি চাই না, তোমাদের সুখ শান্তি চাই। তুমি তোমার বাবা মায়ের বড় ছেলে। তারা তোমাকে কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন। তোমার উপর তাদের কত আশা ভরসা। তুমি তাদের সুখী করার চেষ্টা কর। তাদের কথার অবাধ্য হয়ো না। আমাদের গ্রামে এক ওয়াজ মাহফিলে একজন আলেম ওয়াজ করার সময় বলেছিলেন, আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে আছে, "হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর স্ত্রীর কোনো দোষ দেখে তাকে পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। হযরত ইসমাইল (আঃ) পিতার কথামত সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন।" তুমিও যদি তাই কর, তাহলে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ দুনিয়াতে আমার চেয়ে কত সুন্দরী মেয়ের ভাগ্য খারাপ রয়েছে। তাদের তুলনায় আমি অতি নগণ্য। আমি মনে করব, এটাই আমার তকদির।

হারুন রোকেয়ার কথা শুনে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল। অনেক রাতে যখন ফিরে এল তখন রোকেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। হারুন জানে, রোকেয়া না খেয়ে ঘুমিয়েছে। তাই সেও না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এই ঘটনার দু'দিন পর আজ হারুন বিদেশ চলে যাবে। গত দু'দিন থেকে রোকেয়ার চোখ থেকে সব সময় পানি পড়ছে। কিছুতেই সামলাতে পারছে না। স্বামীর

সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে রোকেয় কদমবুসি করে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠে বলল, আমি তোমার এমন পাপী ও হতভাগী স্ত্রী যে, তোমাকে দুঃখ নিয়ে বিদেশ যেতে হচ্ছে। আমাকে তুমি মাফ করে দাও।

হারুন তাকে বুকে চেপে ধরে বলল, রোকা প্রিয়তম আমার, আমিও তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়ে বিদেশ চলে যাচ্ছি। আল্লাহপাক জানেন, আবার কবে তোমাদের মাঝে ফিরে আসব। তোমার দুঃখ কোনোদিন ঘোচাতে পাবর কি না তাও আল্লাহপাক জানেন। তুমি আমার উপর কোনো রকম মনে কষ্ট রেখ না। আমিও রাখব না। আমরা দু'জনেই আল্লাহপাকের দরবারে দো'য়া চাইব, তিনি যেন আমাদেরকে সুখ-শান্তি দান করেন। তারপর গভীর আবেগে তার দু'গাল চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে রাগল।

রোকেয়াও চুপ করে থাকল না, সেও প্রতিদানে মেতে উঠল। রোকসানা এতক্ষণ খাটের উপর বসে মা-বাবার দিকে তাকিয়েছিল। সেদিকে হারুনের লক্ষ্য পড়তে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, রোকা, মামণির দিকে খুব খেয়াল রাখবে। আর আম্মাকে যতটা সম্ভব খুশি রাখার চেষ্টা করবে।

এমন সময় হারুনের ছোট ভাই দরজার কাছে এসে বলল, স্কুটারওয়ালা তাড়াতাড়ি যেতে বলছে।

হারুন বলল, হ্যাঁ চল যাচ্ছি। তারপর রোকসানাকে রোকেয়ার কোলে দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এসে আব্বা আম্মাকে কদমবুসি করে আম্মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আম্মা, তোমারে বৌকে দু'মাস অন্তর বাপের বাড়ি পাঠিও।

হানুফা বিবি বললেন, ওসব আমি জানি না। তুই পারলে চিরকালের জন্য বৌকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে যা।

হারুন মেয়ের কথা শুনে মনে খুব কষ্ট পেলেও বিদেশ যাওয়ার সময় বলে প্রতিবাদ করল না। রোকেয়াকে বলল, তোমার যখন মন চাইবে তখন যেও। যে ক'দিন থাকতে মন চাইবে, সেই ক'দিন থেকে আবার নিজেই চলে এস। তারপর সে ব্রীফকেস হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে স্কুটারে উঠল।

সাত

হারুন দুবাই পৌছে রোকেয়াকে চিঠি দিল।

রোকেয়া চিঠি পেয়ে পড়তে লাগল–

ওগো আমার প্রাণহরিণী,

কোন সুদূরে আছ তুমি? প্রথমেই তোমাকে জানাই আন্তরিক দো'য়া ও ভালবাসা। আর তোমার নরম ঠোঁটে আমার গরম চুমো পাঠালাম। ঠাণ্ডা হতে দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি নিও। পরে স্নেহের পুতলী রোকসানাকে স্নেহ চুম্বন দিও। রোকা, সেদিন তোমাকে একা ফেলে রেখে আসতে আমার খুব খষ্ট হয়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে, বিয়ের পর থেকে তোমাকে এতটুকু সুখ শান্তি দিতে পারি নি। শুধু দুঃখ দিয়েই চলেছি। শোন রোকা, আম্মা কিছু বললেই তুমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দাও, এটা ঠিক নয়। লক্ষীটি খাওয়া নিয়ে রাগ করো না। কারণ একদিকে যেমন তোমার শরীর নষ্ট হবে, অপরদিকে কেউ তোমাকে খেতে বলবে না। আমার কথা ভেবে শরীরের যত্ন নিও। আল্লাহপাকের কাছে কামনা করি, তুমি সুখে থাক, শান্তিতে থাক। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করো।

রোকসানাকে চোখে চোখে রাখবে। পরিশেষে আল্লাহপাকের দরবারে তোমার কুশল কামনা করে এবং তোমার চিঠির আশায় থেকে শেষ করছি।

ইতি

তোমার প্রাণপ্রিয় স্বামী

হারুন।

চিঠি পড়ে রোকেয়ার মন বেদনায় ভরে গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিন্তা করল, হারুন তুমি শুধু আমার রাগটা দেখলে; কিন্তু কেন রাগ করি সেটা জেনেও তার বিহিত করে গেলে না। তোমার মা যে উঠতে বসতে ঝগড়া করে, গালাগালি করে, মিথ্যে বদনাম দেয়, সে সব নিজের চোখে দেখে শুনেও আমাকে এখানে রেখে গেলে। আমি যে কি হালে এখানে থাকি তাও তুমি জান। তবু তার কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করে গেলে না। এই সব চিন্তা করে রোকেয়া এখানকার ভালো-মন্দ খবর জানিয়ে সাদামাটা একটা চিঠি লিখে স্বামীর পত্রের উত্তর দিল।

এবারে হারুন চলে যাওয়ার পনের বিশ দিন পর একদিন হানুফা বিবি রোকেয়াকে বললেন, তুই এবার বাপের বাড়ি চলে যা। তোর জন্য আমার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। তোর পাপের জন্য আমার ছেলেদের অসুখ লেগেই আছে, নচেৎ তাদেরকে বাঁচাতে পারব না। তুই আমার সংসার নষ্ট করেছিস। যা যা চলে যা, আর থাকিস না। এরকমভাবে প্রায় প্রতিদিন বলতে লাগলেন। আর একদিন বললেন, তোকে এত করে চলে যেতে বলি, যাস না কেন? তোর বাপ ভাই বোধহয় তোকে খাওয়াতে পারবে না। তাই বুঝি যেতে চাস না।

রোকেয়া প্রতিদিন শাশুড়ীর মুখে একই কথা শুনে স্বামীর উপদেশের কথা ভেবে এতদিন সহ্য করে আসছিল। কিন্তু আজ তাকে বাপ মা তুলে কথা বলতে শুনে আর সহ্য করতে পারল না। বলল, আম্মা, কেউ কাউকেই খাওয়াতে পারে না। খাওয়াবার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই সকল প্রাণীর রেযেকদাতা।

হানুফা বিবি রেগে গিয়ে তার একটা হাত ধরে গেটের বাইরে বের করে দিয়ে গেট বন্ধ করে বললেন, যা চলে যা, আর আসবি না।

রোকেয়া গেটের বাইরে বসে বসে কাঁদতে লাগল।

শেষে প্রায় ঘন্টা দুই পর রোকসানা যখন মায়ের জন্য খুব কান্নাকাটি করতে লাগল তখন বদরুদ্দিন বৌমাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

দু'তিন দিন পর রোকেয়া চাচি শাশুড়ীদের ও চাচাতো জায়েদের ডেকে বলল, আমার শাশুড়ী সব সময় আমাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলেন, তবু আমি যাইনি। দু'দিন আগে যে আমাকে উনি ঘর তেকে বের করে দিয়েছিলেন, আপনারাও জানেন। এখন আপনারাই বলুন আমি কি করব?

তাদের মধ্যে কেউ বললেন, আমরা কিছু বলতে পারব না। আবার কেউ বললেন, তোমার শাশুড়ী বললেও যাওয়া ঠিক হবে না। শুধু এক চাচাতো জা বলল, তুমি তোমার স্বামীর কাছে চিঠি দিয়ে জেনে নাও।

এর কয়েকদিন পর রোকেয়া রোকসানাকে নিয়ে একাই বাপের বাড়ি এল। তারপর মা বাবাকে বলল, আমি আর শ্বশুরবাড়ি যাব না। কারণ আজ দু'বছর ধরে আমার শাশুড়ী আমাকে চলে আসতে বলছে। এমন কি একদিন ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।

সেদিন রোকেয়ার নানি রহিমন বিবিও মেয়ের বাড়ি এসেছেন। তিনি নাতনির কথা শুনে বললেন, তোর এখানে থাকা চলবে না। কয়েকদিন বেড়িয়ে চলে যা। আর কখনো হুট করে চলে আসবি না। তোর শাশুড়ী যতই তোকে বের করে দিক, তবু আসবি না। তুই দুয়ারে বসে থাকবি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি, শাশুড়ী বের করে দিয়েছে।

রোকেয়ার বাবা শাহেদ আলী বললেন, এবার যখন তোর শাশুড়ী চলে আসতে বলবে তখন তাকে বলবি, আমার বাবাকে ডেকে এনে তারপর যেতে বলবেন।

সপ্তাহখানেক পর লোকের মুখে শাহেদ আলী খবর পেলেন, রোকেয়ার শাশুড়ীর কঠিন অসুখ। সে কথা বাড়ির সবাইকে জানিয়ে রোকেয়াকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

রোকেয়া চিন্তা করে রেখেছিল, হারুন বিদেশ থেকে ফিরে এসে নিয়ে না গেলে সেখানে যাবে না। কিন্তু মা বাবা যখন পাঠাতে চাইলেন তখন নিরুপায় হয়ে চলে এল। এসে দেখল, শাশুড়ীর ভীষণ অসুখ। চলাফেরা করতে পারেন না। রোকেয়া সংসারের সব কাজ করার সাথে সাথে শাশুড়ীর সেবা যত্ন করতে লাগল। অসুখ আরো বেড়ে যেতে হানুফা বিবিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু হাঁটা চলা করতে পারছেন না। তাকে ওষুধ খাওয়ান, গোসল করান ও ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া, সব কিছু রোকেয়াকে করতে হচ্ছে।

মায়ের অসুখের কথা চিঠিতে জানতে পেরে হারুনের মেজভাই শামসু বিদেশ থেকে বাড়ি এল। যখন শামসু বাড়িতে ঢুকল তখন রোকেয়া শাশুড়ীকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরতে এলে হানুফা বিবি বৌয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বললেন, তোকে ধরতে হবে না, আমি যেতে পারি। তারপর তিনি বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শামসুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রোকেয়া শামসুকে আসতে দেখেনি। শাশুড়ীর দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখল, শামসু আসছে। তখন সে বুঝতে পারল, কেন শাশুড়ী তাকে ধরতে দিল না। শামসুকে জানাতে চান, বৌ আমার সেবা যত্ন করে নি। এখন তাকে দেখে অভিনয় করছি। ততক্ষণে শামসু মাকে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, আম্মা, এখন তুমি কেমন আছ? তোমার অসুখের কথা জেনে চলে এলাম।

হানুফা বিবি ছেলের মাথায় চুমো খেয়ে দো'য়া করে বললেন, এখন একটু ভালো আছি। তুই ঘরে যা, আমি বাথরুম থেকে আসছি। তারপর আস্তে আস্তে বাথরুমে গেলেন।

শামসু এবার রোকেয়াকে বলল, ভাবি কেমন আছ?

রোকেয়া মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আল্লাহপাকের রহমতে ভালো আছি।

শামসু জিজ্ঞেস করল, রোকসানা কোথায়?

রোকেয়া বলল, রুমে ঘুমোচ্ছে। তা তোমার ভাইয়া কেমন আছে?

শামসু হেসে উঠে বলল, ভাইয়া ভালো আছে। তোমার জন্য সন্দেশ পাঠিয়েছে। তারপর ব্যাগ খুলে মুখ আঁটা একটা চিঠি বের করে তার হাতে দিল।

রোকেয়া চিঠিটা নিয়ে রুমে এসে পড়তে লাগল–

প্রিয়তমা রোকা,

পত্রে আমার আন্তরিক সবকিছু নিও। রোকসানাকে আমার আন্তরিক দো'য়া ও স্নেহাশীষ দিও। আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। তবে তোমার কথা ভেবে ভেবে বড় অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আল্লাহ কবে যে তোমাদের কাছে নিয়ে যাবেন, সে

কথা তিনিই জানেন। তুমি ও রোকসানা কেমন আছ জানাবে। অনেক দিন তোমার পত্র না পেয়ে চিন্তিত আছি। পত্র দিয়ে চিন্তা দূর করো। আল্লাহপাকের দরবারে আমার জন্য দো'য়া করো। আমি তাঁর দরবারে তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করছি। আজ এই পর্যন্ত থাক। বেশি কিছু লিখতে মন চাইছে না। কারণ শামসু বাড়ি যাচ্ছে, আমারও যাওয়ার জন্য মন খুব ছটফট করছে। কিন্তু ছুটি পেলাম না বলে যেতে পারলাম না। তোমার নরম গালে ও ঠোঁটে কয়েকটা চুমো পাঠালাম, গ্রহণ করে এই হতভাগাকে ধন্য করো। আর পত্রে আমার জন্য তুমিও কিছু পাঠিও। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

তোমার হারুন।

এমন সময় রোকসানা ঘুম থেকে উঠে আম্মা আম্মা বলে কেঁদে উঠতে রোকেয়া চিঠিটা বালিশের নিচে রেখে রোকসানাকে কোলে তুলে নিল।

এবারে শামসু এসে বিয়ে করার কথা জানাল।

হানুফা বিবি মেয়ের সন্ধান নিয়ে একদিন শামসুকে বললেন, তোর ভাবিকে নিয়ে মেয়ে দেখে আয়।

শামসু বলল, ভাবির যাওয়ার দরকার নেই। আমি প্রথমে একা দেখে আসি। তারপর ভাবিসহ সবাই দেখে আসবে।

হানুফা বিবি তার কথা শুনলেন না। বৌকে ডেকে বললেন, তুই শামসুর সঙ্গে গিয়ে মেয়ে দেখে আয়।

রোকেয়া রান্নাঘর থেকে তাদের কথা শুনেছে। তাই বলল, যে বিয়ে করবে সে আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না, আমি যাব কি করে?

শামসু ততক্ষণে মেয়ে দেখতে চলে গেছে। তাই তখন হানুফা বিবি আর কিছু বললেন না। একদিন হানুফা বিবি বাড়ির সকলের সামনে বললেন, রোকসানার মায়ের মতো মেয়ে এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তাকে কত করে বললাম মেয়ে দেখতে যেতে, সে দেমাগ করে গেল না। আমরা জানি, ভাবিরাই মেয়ে দেখে দেবরদের বিয়ে দেয়। আমাদের বৌটার পেটে খুব হিংসা।

রোকেয়া চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আম্মা, আপনি যুক্তি ছাড়া কথা বলেন। আপনি মেয়ে দেখতে যেতে বললেন, আর মেজভাই বলল, সে আগে একা মেয়ে দেখে পছন্দ হলে পরে আমরা যাব। তাহলে কেমন করে যাই আপনারাই বলুন।

হানুফা বিবি রেগে উঠে বললেন, আমাকে কি তুই এতই বোকা পেয়েছিস? আমি কি কিছু বুঝি না। তোর যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে শামসুর সঙ্গে জোর করে যেতে পারতিস।

রোকেয়া শাশুড়ীকে রেগে যেতে দেখে আর কিছু বলল না।

শামসু মেয়ে দেখে এসে পছন্দ হয়েছে বলার পর একদিন সবাই মিলে গিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে এল। কিন্তু রোকেয়াকে কেউ যেতে বলেনি বলে সে গেল না। কয়েকদিন পর রোকেয়া একদিন শামসুর ঘর পরিষ্কার করছিল। হানুফা বিবি সেখানে এসে ঝংকার দিয়ে বললেন, তোকে কে এসব করতে বলেছে? জা আসবে সেই হিংসাতে তাকে দেখতে গেলি না। এখন আবার তার ঘর পরিষ্কার করছিস। তারপর রোকেয়ার একটা হাত ধরে ঘর থেকে বের করে দিলেন।

রোকেয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে এল।

বিয়ের দিন শামসু বৌ নিয়ে এলে বৌয়ের এবং তার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের আদর আপ্যায়ন দেখে রোকেয়ার নিজের বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন তার ও তার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদেরকে কি রকম আদর আপ্যায়ন করেছিল, আর এদের কি রকম আদর আপ্যায়ন করা হচ্ছে। এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় রোকেয়ার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল।

শামসুর বৌ সায়লা খুব ভালো মেয়ে। দেখতে শুনতে যেমন, আচার ব্যবহারও তেমনি। দু'একদিনের মধ্যে রোকেয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। দু'জন দু'জনকে খুব পছন্দ করল। দু'জায়ে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম, করতে লাগল।

একদিন শায়লা রোকেয়াকে বলল, তুমি আগে মরলে, তোমার পাশে আমার কবর দিতে বলব।

রোকেয়া মনে মনে খুব খুশি হয়ে ভাবল, আল্লাহ বুঝি এবার তার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। জা যখন মনের মত হয়েছে তখন শাশুড়ী আর বেশি কিছু বলতে পারবে না। বলল, মরণ বাঁচনের কথা আল্লাহ জানেন।

মেজ জাকে নিয়ে রোকেয়া বেশ আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাতে লাগল। শাশুড়ী আর সংসারের দিকে ফিরেও তাকাননি। যা কিছু দু'জায়ে মিলেমিশে করে। মাঝে মাঝে এক জা অন্য জাকে নিয়ে তাদের বাপের বাড়ি থেকে দু'চার দিন করে বেড়িয়ে আসে।

কিন্তু যার তক্বদির খারাপ, তার কেউ ভালো করতে পারে না। কিছুদিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর হানুফা বিবি দু'বৌয়ের মধ্যে এত মিলমিশ সহ্য করতে পারলেন না। মেজ বৌ শায়লার কাছে বড় বৌ রোকেয়ার অনেক বদনাম করতে শুরু করলেন।

শাশুড়ী যখন একদিন শায়লার কাছে রোকেয়ার নানারকম বদনাম করলেন, তখন সে চুপ করে শুনলো। তারপর সময় মতো রোকেয়ার কাছে এসে বলল, বুবু, আম্মা আজ আমার কাছে তোমার অনেক বদনাম করলেন। আমি সেসব বিশ্বাস করিনি। আমি জানি, সব মিথ্যে কথা। আসলে উনি আমাদের দু'জনের মিল সুনজরে দেখতে পারছেন না এবং সহ্যও করতে পারছেন না। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, আম্মা যা কিছু বলুক না কেন, আমরা দু'জনে তার কথায় কান দেব না।

রোকেয়া বলল, আমি তোমার মতই একটা বোন চেয়েছিলাম। আল্লাহ মিলিয়েও দিয়েছেন। সেজন্য তাঁর পাক দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া জানাই।

এদিকে সবার অলক্ষ্যে রোকেয়ার ভাগ্য হাসছে। দু'জায়ের এত ভাব থাকা সত্বেও এ সুখ শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হল না।

একদিন হানুফা বিবি শায়লাকে গোপনে বললেন, মেজ বৌ, রোকসানার মায়ের সাথে বেশি মেলামেশা করো না। তুমি এখন নতুন। তাকে চিনতে পারনি। সে খুব জঘন্য ধরনের মেয়ে। তোমার ভাসুরকে কতবার মেরেছে। তোমার ভাসুর খুব ভালো। বৌ ছেড়ে দিলে বংশের বদনাম হবে, তাই ওকে নিয়ে ঘর করছে। ওর সঙ্গে মিশলে তুমিও খারাপ হয়ে যাবে।

শায়লা শাশুড়ীর কথা শুনে খুব অবাক হয়ে বলল, আম্মা, এ আপনি কি বলছেন? মেয়ে মানুষ যতই খারাপ হোক, সে কোনোদিন স্বামীর গায়ে হাত তুলতে পারে না।

হানুফা বিবি বললেন, আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু রোকসানার মা খুব ছোট ঘরের মেয়ে। তার স্বভাব-চরিত্র আর কত ভালো হবে? তা না হলে স্বামীর গায়ে হাত তুলে! তাই তো তোমাকে সাবধান করে দিলাম।

শায়লা শাশুড়ীর কথা বিশ্বাস করতে পারল না। একসময় রোকেয়াকে জিজ্ঞেস করল, বুবু, তুমি নাকি রোকসানার আব্বাকে মারধর কর?

রোকেয়া বলল, সেকথা পরে বলছি; আগে বল কার কাছে শুনেছ?

আম্মার কাছে।

রোকেয়া রসিকতা করার জন্য হেসে উঠে বলল, হ্যাঁ,শায়লা করি। রোকসানার বাবা একটু অশিক্ষিত ছিল। তাই মারধর করে কিছু শিক্ষা দিয়েছি।

শায়লাও হেসে উঠে বলল, ধ্যাৎ, তুমি ইয়ার্কি করছ। আম্মা যখন বললেন, তখন যেমন বিশ্বাস করিনি, এখন তোমার কথাও তেমনি বিশ্বাস করিনি।

রোকেয়া হাসি থামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, কিছু বুঝতে পারছ?

শায়লা বলল, কি বুঝব বুবু?

রোকেয়া বলল, সেদিন তুমি বললে না, আমাদের দু'জনের মিলমিশ আম্মা সহ্য করতে পারছেন না?

শায়লা বলল, হ্যাঁ, তা তো বলেছিলাম। কারণ তখন আমি তাই বুঝেছিলাম।

রোকেয়া বলল, তাহলে এখনো বোঝা উচিত ছিল, সেই মিলমিশ ছাড়াবার জন্য গুটির চাল চালাচ্ছেন।

শায়লা বলল, বুবু, তুমি ঠিক কথা বলেছ। এখন আমি বুঝতে পারলাম।

এর কিছুদিন পর হারুনের সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের খাৎনা হল। ধোয়ানীর দিন খুব বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে মিলাদ মাহফিল হবে। তারপর মেহমানদের খাওয়ান হবে।

রোকেয়া তখন বাপের বাড়িতে ছিল। শামসু একদিন দাওয়াত করতে এলে রোকেয়া তার সঙ্গে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করার পর আপ্যায়ন করাল।

আপ্যায়নের পর শামসু বলল, ভাবি, তালই সাহেব কি বাড়িতে নেই?

রোকেয়া বলল, সকালে মামা এসেছিল, আব্বা তার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি।

শামসু বলল, তাহলে মাওই সাহেবকে একটু ডেকে দাও।

রোকেয়া মায়ের কাছে গিয়ে বলল, তোমাকে আমার মেজ দেবর ডাকছে। মেহেরুন্নেসা মেয়ের সঙ্গে শামসুর কাছে এসে তাদের বাড়ির ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

শামসু সে সবের উত্তর দেওয়ার পর ছোট ভাইয়ের খাৎনার অনুষ্ঠানের দাওয়াত দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রোকেয়ার ছোট বোন জুলেখা সেখানে ছিল। শামসু চলে যাওয়ার পর রোকেয়াকে বলল, মেজ আপা, তোমার দেবর কই তোমাকে কিছু বলল না যে? তুমি কি যাবে?

রোকেয়া বলল, ভেবে দেখি কি করা যায়। তারপর চিন্তা করতে লাগল, আব্বা তো যাবেই না, কাউকে যেতেও দেবে না। আরো চিন্তা করল, আমার শাশুড়ী না হয় আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেনি; কিন্তু শায়লা শামসুর হাতে যাওয়ার কথা বলে দিল না কেন? আর শামসু নিজেও তো সেকথা বলতে পারত? ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, সে যাবে।

অনুষ্ঠানের দিন মা-বাবাকে বলে সে একটা স্কুটার করে শ্বশুর বাড়ি এল।

বাড়িতে পৌছাতেই হানুফা বিবি বললেন, তোকে তো আসতে বলিনি, তবু তুই এলি কেন? তোর মা-বাপকে দাওয়াত দিতে শামসুকে পাঠিয়েছিলাম। কিছু দেওয়ার

ভয়ে বুঝি তারা না এসে তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

বাড়ি ভরা মেহমানদের সামনে শাশুড়ীর কথা শুনে রোকেয়া অপমানে ও লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। মাথা হেট করে নিজের রুমে চলে গেল। রুমের ভেতর থেকে শুনতে পেল, শ্বাশুড়ী মেহমানদের বলছেন, আমার এ বৌটা খুব অপয়া। তাই এমন শুভ অনুষ্ঠান করার আগে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বেয়াই-বেয়ানকে দাওয়াত না দিলে লোকে মন্দ বলবে বলে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। তারা গরিব, খালি হাতে কি করে বড় লোকের অনুষ্ঠানে আসবে, তাই মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শাশুড়ীর মুখে মেহমানদেরকে এসব কথা বলতে শুনে রোকেয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আল্লাহকে জানাল, ইয়া আল্লাহ, এসব শোনার আগে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলে না কেন? তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে রোকেয়া সংসারের কাজে লেগে গেল।

অনুষ্ঠানের সময় যখন ছবি তোলা হচ্ছিল তখন হানুফা বিবি রোকেয়াকে বললেন, তুই এখান থেকে চলে যা, এদের সঙ্গে তোর ছবি তোলা যাবে না। এদের সঙ্গে ছবি তুললে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সমস্ত লোকজন ও মেহমানদের সামনে শাশুড়ীর কথা শুনে লজ্জায় ও মনের কষ্টে রোকেয়ার চোখে পানি এসে গেল। সে আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না। এরকম ছুটে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। সারাদিন আর ঘর থেকে বের হল না। ভাবল, শায়লাও কি তাদের দলে ভিড়ে গেল? তা না হলে সে আমার হয়ে কিছু বলল না কেন?

অনুষ্ঠানের পরের দিন থেকে হানুফা বিবি রোকেয়াকে বাপের বাড়ি চল যাওয়ার জন্য বার বার তাগিদ দিতে লাগলেন।

একদিন রোকেয়ার মেজ ভাই বখতিয়ার বোনের বাড়ি এল। তার সামনে হানুফা বিবি রোকেয়ার হাত ধরে বের করে দেওয়ার সময় বললেন, যা এক্ষুণি তুই তোর ভাইয়ের সঙ্গে চলে যা। এখানে থাকলে তুই মেজ বৌকেও খারাপ করে ফেলবি। আজ তিন বছর ধরে তোকে চলে যেতে বলছি এবং কতবার ঘর থেকে বের করেও দিয়েছি, তবুও তুই যাসনি কেন?

বখতিয়ার এবছর বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে। সে এর আগে মাত্র একবার এখানে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে চলে গিয়েছিল। আজ দ্বিতীয় বার এসেছে। রোকেয়ার শাশুড়ী সম্পর্কে অনেক ভালো-মন্দ কথা সে শুনেছিল। এখন তার সামনেই বোনকে এরকম করতে ও বলতে দেখে যেমন অবাক হল তেমনি খুব রেগেও গেল। বলল, মাওই আম্মা, আপনি মানুষ না অন্য কিছু? তারপর রোকেয়াকে বলল, যা তোর মেয়েকে নিয়ে আয়। এক্ষুনি তোদেরকে নিয়ে যাব। তুই তোর শাশুড়ীর এত অত্যাচার সহ্য করে আছিস কি করে? শিগগির যা করতে বললাম কর।

হানুফা বিবি বখতিয়ারের কথা শুনে রাগে ফেটে পড়লেন। এতদিন কোথায় ছিলে গো নবাবের বাচ্চা, বোনের হয়ে দরদ দেখাতে এসেছ। যাও নিয়ে যাও তোমার বোনকে। আর যেন এখানে না আসে। আমরা আমাদের ছেলের আবার বিয়ে দেব। মনে করেছ, তোমার বোন চলে গেলে আমরা ছেলের আর বিয়ে দিতে পারব না?

বখতিয়ার কিছু বলতে যাচ্ছিল, রোকেয়া শাশুড়ীর হাত থেকে নিজের হাতে ছাড়িয়ে নিয়ে বখতিয়ারের দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মেজ ভাই, তোমার পায়ে ধরে বলছি, তুমি এখান থেকে যাও; আমি যাব না। এটা আমার স্বামীর ঘর। উনি

আমার শাশুড়ী। ওঁকে কিছু বলার অধিকার তোমার নেই। আমাকে এরা তাড়িয়ে দিলেও আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে যাব না। তুমি চলে যাও মেজ ভাই, চলে যাও। তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বখতিয়ার বোনের ওপর রেগে গিয়ে বলল, তবে তুই এখানে পড়ে পড়ে মর, আমি চললাম। একথা বলে সে হন হন করে চলে গেল।

বাড়িতে এসে বখতিয়ার বাবা-মাকে রোকেয়ার শ্বশুর বাড়ির সব ঘটনা খুলে বলে বলল, তোমরা এমন ছোটলোকের বাড়িতে রেকেযার বিয়ে দিয়েছ, যেখানে সে জীবনে কোনোদিন সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পাবে না। বাবারে বাবা, ওর শাশুড়ী যে এত জঘন্য মেয়ে যা দেখা তো দূরের কথা, কারো মুখে কোনোদিন শুনিনি।

ছেলের কথা শুনে মেহেরুন্নেসা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বিয়েটা তখন ভেঙে গিয়ে ভালোই হয়েছিল, কিন্তু....।

ভারাক্রান্ত মুখে শাহেদ আলী স্ত্রীর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি তক্বদিরে যা রেখেছেন তা হবেই। সেখানে কারো কিছু করার নেই।

এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর শায়লার কোল আলো করে একটা ছেলে হল।

একদিন ঘরে তরিতরকারী কম ছিল। তাই রোকেয়া শাশুড়ীকে সেগুলো দেখিয়ে বলল, আজ ঘরে যা আছে তা দিয়ে চালিয়ে দিই আম্মা? কাল না হয় বাজারে পাঠাবেন।

হানুফা বিবি বললেন, বাবারে বাবা, এটা কোনোদিন আমরা পারব না। তোর বাপেরা গরিব। তোদের অভ্যাস আছে, তোরা করতে পারিস।

রোকেয়া মনে কষ্ট পেয়ে চুপ করে রইল।

যেদিন রোকেয়ার মেজ দেবরের ছেলের আকীকার অনুষ্ঠান হবে, সেদিন হঠাৎ করে হারুনের নানি সখিনা বিবি বললেন, আমি বাড়ি চলে যাব। উনি আগের থেকে এখানে আছেন।

হানুফা বিবি বললেন, কেন আম্মা, তুমি চলে যেতে চাচ্ছ? আজ শামসুর ছেলের আকীকার অনুষ্ঠান?

সখিনা বিবি রসিকতা করার জন্য বললেন, এখানে আর ভালো লাগছে না। তোদের বৌগুলো আমার সাথে কথা বলে না।

হানুফা বিবি রাগের সঙ্গে বললেন, কোন বৌ তোমার সঙ্গে কথা বলে না?

সখিনা বিবির মুখ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এল, রোকসানার আম্মা।

হানুফা বিবি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, আমি আগেই জানতাম। আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন এলেই রোকসানার মা রিশ করে মুখ ভার করে থাকে। তারপর রোকেয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বল, তুই এমন করিস কেন? আমার আত্মীয়-স্বজনরা কি তোর বাপের খানা খায়? বল মাগী চুপ করে থাকিস না। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

সেখানে হানুফা বিবির এক চাচাতো জা ছিলেন। তিনি হানুফা বিবিকে বললেন, এসব তুমি কি বলছ হারুনের মা? তোমার আত্মীয়-স্বজন এলে রোকসানার মাকে তো কোনোদিন মুখ ভার করতে আমরা দেখিনি। এসব কথা তোমার মুখে সাজে না।

হানুফা বিবি বললেন, তোমরা আমার ঘরের খবর জানবে কি করে? যার যার ঘরের খবর সে-ই জানবে। তোমরা চুপ করে থাক। তারপর রোকেয়াকে বললেন, যা এবার তুই এখান থেকে চলে যা। আর তোকে আমি খাওয়াতে পারব না। তোর স্বামী আর

টাকা পাঠায় না। তোদের মা-বেটির জন্য চুরি করতে যাব নাকি? যা, যা, চলে যা। এত বলি তবু যাস না কেন? তোর জন্য আমার মেজ বৌটাও খারাপ হয়ে গেল। তুই-ই তাকে খারাপ করেছিস। তোর জন্য আমার সোনার সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। তুই যাবি কি না বল? এই বলে রোকেয়ার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন।

রোকেয়া এতদিন স্বামীর কথা স্মরণ করে শাশুড়ীর শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাসহ্য করে আসছিল। আজ আর পারল না। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আম্মা, আপনি আমাকে সব সময় যাতা বলে গালাগালি করেন। এমনকি আমার বাবা-মাকেও করেন। আমি অন্যায় না করলেও মিথ্যে অপবাদ দিয়ে গালাগালি করেন। কোনোদিন আমি প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আজ আর আমি চুপ করে থাকব না। আপনাকে বলতেই হবে, কেন আপনি শুধু শুধু আমার ওপর এত অত্যাচার করেন? আমার কি এমন অপরাধ?

হানুফা বিবি এমনি রেগে ছিলেন। তার উপর বৌয়ের সাহস দেখে আরো রেগে গিয়ে উচ্চ স্বরে বললেন, তুই কে যে, তোর কথার উত্তর দিতে হবে? তোর কোনো কথা শুনতে চাই না। তোকে আমার ভালো লাগে না। আর কোনোদিন লাগবেও না। তোর পায়খানা দেখতে ইচ্ছা হয়, তবু তোর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না। এখন তুই আর কোনো কথা না বলে চলে যা। তোর ও তোর মেয়ের পেছনে কি কম টাকা খরচ হয়? আমাদের এতগুলোর চেয়ে তোদের মা-বেটির পেছনে বেশি খরচ হয়!

শাশুড়ী বৌয়ের মধ্যে যখন এসব কথা হচ্ছিল, তখন সেখানে সখিনা বিবি, শায়লা, বদরুদ্দিন ও বাড়ির অন্যান্য সবাই এবং আশপাশের বাড়ির হারুনের কয়েকজন চাচি ও তাদের বৌয়েরা ছিলেন!

এত লোকের সামনে রোকেয়া অপমানিত হয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। বলল, আম্মা, আপনি আজ তিন বছর ধরে চলে যেতে বলছেন; কিন্তু কেন আমি যাব? আমি কি প্রেম করে আপনার ছেলেকে ভুলিয়ে বিয়ে করেছি? না পালিয়ে এসে তার সাথে বিয়ে বসেছি? যার জন্য এত জ্বালাচ্ছেন। মনে রাখবেন, আপনি যেমন পরের ঘরে এসেছেন, আমিও তেমনি পরের ঘরে এসেছি। এ ঘর যেমন আপনার বাবার নয়, তেমনি আমার বাবারও নয়। এটা যেমন আপনার স্বামীর ঘর, তেমনি আমারও স্বামীর ঘর। এখানে আপনার যেমন অধিকার আছে, তেমনি আমারও আছে। আমার অসুখের সময় আমার আম্মা একদিন আমাকে দেখতে এসেছিল। তার আগে-পরে কোনোদিন আসেনি। সেদিন এদিকে এক ডাক্তারের কাছে এসে আমার অসুখের কথা শুনে দেখতে এসেছিল। ঐদিন ঘণ্টাখানেক থেকে চলে যাওয়ার পর আপনি বললেন, তোর মায়ের অসুখ বলল, নচেৎ ঝুটি ধরে কাজে লাগিয়ে দিতাম। সেদিন কেন আমার আম্মাকে এত বড় কথা বলেছিলেন? সে কি আপনার খায়, না পরে। আপনি পেয়েছেন কি? যেতে বললেই আমি চলে যাব? যাব না, দেখি আপনি কি করতে পারেন?

হানুফা বিবি কোনোদিন রোকেয়াকে রা করতে দেখেননি। আজ এত কথা বলতে শুনে বেশ একটু দমে গেলেন। গলার স্বর নামিয়ে বললেন, যাবি কি করে? বাপ-ভাই খাওয়াতে পারলে তো যাবি? তারপর কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললেন, এখন বল, আমার বুড়ো মা এলে রিশ করে মুখ ভার করে থাকিস কেন? এটা তো আর মিথ্যে না? সকলের সামনেই আম্মা বলল।

তখন রমযান মাস। রোকেয়া নানি শাশুড়ির দু'হাত ধরে বলল, নানি আপনি রোযা মুখে বলুন, আমি আপনার প্রতি রিশ করে মুখ ভার করে থাকি কি না?

একথা শুনে সখিনা বিবি কেঁদে ফেললেন। বললেন, নাতবৌ হিসেবে আমি তোমাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছি। আর সেই কথা নিয়ে তোমার শাশুড়ী এমন করবে ভাবতেই পারিনি। তাকে বোঝালেও বোঝে না। বাবা আর আমি কোনোদিন এখানে আসব না। একথা বলে তিনি চলে যেতে চাইলেন।

রোকেয়া চিন্তা করল, এখন যদি নানি চলে যান, তাহলে শাশুড়ী তার উপর আরো জুলুম করবে। তাই সে নানির হাতে-পায়ে ধরে যেতে দিল না।

পরের দিন রোকেয়া হারুনকে চিঠি দিল। চিঠিতে বাড়ির বিস্তারিত সবকিছু লেখার পর আরো লিখল, তোমার বাড়ি আর এক মুহূর্তে থাকতে আমার ইচ্ছা হয় না। তবে তুমি যদি বল, তোমার মেজ ভাইয়ের বৌয়ের দাসীগিরী করে খেতে, তাহলে তাই হয়ে খাব। নচেৎ তুমি এসে এর একটা ফায়সালা করে যাও।

হারুন তার পত্রের উত্তরে জানাল, রোকা, তুমি পত্র পাওয়ার সাথে সাথে বাপের বাড়ি চলে যেও। আমি টাকা পাঠালে খাবে নচেৎ না খেয়ে থাকবে। আর একটা কথা মনে রেখ, কেউ যদি বলে, তোমাদের খাওয়াতে পারছি না, তাই বাপের বাড়ি চলে এসেছ, তাহলে সেদিন আমার মরণের খবর পাবে।

হারুনের পত্র পেয়ে রোকেয়া বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার নাম করে চলে এল।

মাস দেড়েক পর রোকেয়ার মেজ জা শায়লা একদিন তাকে নিয়ে যেতে এল। রোকেয়ার মা-বাবা ও বাড়ির অন্যান্য সকলে তাকে যেতে বারণ করল।

কিন্তু শায়লা নাছোড় বান্দা। বলল, বুবুকে না নিয়ে আমি একা ফিরে যাব না।

শায়লার জেদাজেদিতে রোকেয়ার মন একটু নরম হল। মা-বাবাকে বলল, আমার জা যখন আশা করে নিয়ে যেতে এসেছে তখন তাকে যদি ফিরিয়ে দিই, আর সেকথা যদি তোমার জামাই শুনে, তাহলে সে খুব মনে কষ্ট পাবে। অথবা আমাকে ও তোমাদেরকে অন্যরকম ভাববে। তার চেয়ে আমি ওর সঙ্গে যাই।

দু'দিন আগে থেকে রোকেয়ার খুব জ্বর। তার কথা শুনে মেহেরুন্নেসা মেয়েকে বললেন, তুই যে যাবি বলছিস, তোর গায়ে তো এখনো বেশ জ্বর রয়েছে। এই ক'দিন আগে ডায়রিয়ায় ভুগলি। তারপর জ্বর হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে যাবি কি করে? শরীর ভালো হোক, তারপর না হয় যাবি।

রোকেয়া বলল, তোমরা বাধা দিও না আম্মা। আল্লাহ চাহে তো জ্বর দু'দিনে ভালো হয়ে যাবে।

মেয়ের যাওয়ার আগ্রহ দেখে তারা আর বাধা দিলেন না।

রোকেয়া রোকসানাকে নিয়ে শায়লার সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি চলে এল। বাড়িতে এসে শাশুড়ীকে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, আম্মা কেমন আছেন?

হানুফা বিবি রোকেয়ার কথার উত্তর না দিয়ে শায়লাকে বললেন, তুমি আনতে যাওনি বলে এতদিন আসেনি। বলেছিলাম না, সব আমার পায়ের তলে। কোনোদিন বাপের বাড়ির ভাত হজম হবে না। তুমি নিয়ে এলে কেন?

শায়লা বলল, আমি তো আনি নাই। রোকসানার মায়ের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে সাথে চলে এল।

হানুফা বিবি বললেন, তোমরা সবাই সবাইয়ের কাছে ভালো থাকবে, আর মাঝখান থেকে আমি দোষী হব, তা হতে দিচ্ছি না। তাকে সাথে করে আনা তোমার উচিত হয়নি।

রোকেয়া খুব জ্বর ছিল বলে শাশুড়ীকে কদমবুসি করে রুমে এসে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। সে শায়লার কথা শুনতে পায়নি। কারণ শায়লা নিচু স্বরে কথা বলছিল। কিন্তু শাশুড়ী জোর গলায় কথা বলছিল বলে তার কথা শুনতে পেয়েছে। একসময় শায়লাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আম্মাকে কি এমন কথা বললে, যা শুনে তিনি ঐসব বললেন?

শায়লা শাশুড়ীকে যা বলেছিল, তা হুবহু বলল।

রোকেয়া খুব অবাক হয়ে বলল, এমন মিথ্যে কথা তুমি বলতে পারলে? তুমি আমাকে দেখতে গিয়ে একরকম বেঁধে নিয়ে এসেছ, আর আম্মাকে বললে, আমি নিজে এসেছি?

শায়লা বলল, সত্য কথা বললে, আম্মা আমাকে গালি দিত এবং বাড়ির সবাই আমার বদনাম করত। তাই মিথ্যে করে বলেছি।

রোকেয়া বলল, তুমি যতটুকু লেখাপড়া করেছ, তার তুলনায় তোমার জ্ঞান একটুও হয়নি। তুমি যদি সত্য কথা বলতে, তাহলে আম্মা গালাগালি করলেও এ বাড়ির ও অন্যান্য বাড়ির সবাই তোমার সুনাম করত। সবাই তখন বলত, শাশুড়ী আনতে বারণ করা সত্ত্বেও জা-জাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তুমি তা না করে মিথ্যে বলে আমাকে সকলের কাছে অপমান করলে।

হানুফা বিবি এতক্ষণ আড়ি পেতে দু'বৌয়ের কথা শুনছিলেন। এবার রুমে ঢুকে রোকেয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মেজ বৌ তোকে আনতে যায়নি, দেখতে গিয়েছিল।

রোকেয়া বলল, আমাকে আনতে যায়নি ঠিক কথা; কিন্তু ধরে আনতে গিয়ে বেঁধে এনেছে।

একথা শুনে হানুফা বিবি শায়লাকে গালাগালি দিতে লাগলেন।

এমন সময় শামসু ঘরে এসে শায়লাকে মা গালাগালি করছে শুনে মাকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে আম্মা? তুমি শায়লাকে গালগালি করছ কেন?

হানুফা বিবি চিল্লে চিল্লে শায়লা কি করেছে বলল।

শামসু শুনে সেও শায়লাকে রাগারাগি করে গালাগালি দিতে লাগল।

হানুফা বিবি শায়লাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কি আমি রোকসানার মাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম, না তুমি তার অসুখের কথা শুনে তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য আমার হুকুম নিয়েছিলে? আমি তো বলেছিলাম, তাকে দেখেই চলে আসবে। আনতে গেলে কেন?

শায়লা কাচুমাচু হয়ে বলল, আম্মা, আমাকে মাফ করে দিন। এ ধরনের ভুল আমি আর কখনো করব না। আমাকে গালাগালি করবেন না। আমি সহ্য করতে পারছি না। তারপর রোকেয়াকে বলল, বুবু আমি না হয় কথাটা বলেই ফেলেছি, তাই বলে তুমি আম্মাকে বলে দিলে কেন?

রোকেয়া বলল, সবাই আমাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে দিয়ে অনেক অপমান করেছে। আমি আর অপমান সহ্য করত পারছি না। এখন থেকে আর চুপ করেও থাকব না। কাউকে ভয়ও করব না। তাতে আমার কপালে আল্লাহ যা রেখেছেন, তাই হবে।

সেদিন তারপর আর কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

আট

রোকেয়া মাসখানেক থেকে বাপের বাড়ি চলে গেল। সেখানে সপ্তাহ খানেক থেকে আবার শ্বশুর বাড়ি ফিরে এল। তারপর রান্না করার সময় শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, আম্মা চাল কত নেব?

হানুফা বিবি বললেন, তুই যখন ছিলি না, তখন এক সের দিয়ে আমাদের সবাইয়ের হয়েও বেঁচে গেছে। এখন তুই ও তোর মেয়ে যখন এসেছিস, তখন দেড় সের নে।

রোকেয়া বলল, আমি আমার মেয়ে কি এক বেলায় আধ সের চাল খাই?

হানুফা বিবি বললেন, না, তোরা মা-মেয়ে বাতাস খেয়ে থাকিস। তোদের জন্য আমার সবদিকে ক্ষতি হচ্ছে। তেল, সাবান ও খাওয়া-দাওয়ায় আমাদের সাত-আটজনের যা লাগে, তার চেয়ে তোদের দু'জনের বেশি লাগে। বল, এগুলো আমি পাব কোথায়? সারাদিন তো একটাও কাজ করিস না, আর কাজ করতেও জানিস না। তুই কি আমাদের মেরে ফেলতে চাস? না বাপু, আর পারছি না। এবার ক্ষমা করে বিদায় হও। তোর ছেলে হয়নি বলে শামসুর ছেলেকে হিংসা করিস। তাকে দেখতে পারিস না। সেজন্য কোনোদিন কোলেও নিসনি।

শাশুড়ীর কথা শুনে রোকেয়া কাঁদতে কাঁদতে শায়লাকে বলল, আমি নাকি তোমার ছেলেকে হিংসা করি, কোনোদিন কোলেও নেইনি?

শায়লা শাশুড়ীর মন রাখার জন্য বলল,আম্মা না দেখলে কি আর মিথ্যে করে বলছে?

একথা শুনে রোকেয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, আম্মার কথা বাদ দাও, তুমি দেখেছ কিনা বল?

শায়লা বলল, আমি দেখলে কি হবে, আম্মা তো দেখেনি?

রোকেয়া তখন শাশুড়ীকে বলল, আম্মা, আল্লাহর নামে কসম করে বলুন তো, আমি মেজ ভাইয়ের ছেলেকে হিংসা করি বা কখনো তাকে কোলে নেইনি।

হানুফা বিবি বললেন, তোর কথায় কসম করতে যাব কেন? আমি দেখেছি বলেই তো বললাম। তোর জন্য মেজ বৌকে শিক্ষা দিতে পারছি না। তুই সবকিছুর ক্ষতির কারণ। তুই নিজে খারাপ, তাই এই বৌকেও খারাপ করছিস। তারপর শায়লাকে বললেন, তোমাকে এত করে বলি যে, ওর সাথে একটুও মিশবে না। তোমাকে যে খারাপ করছে, সেকথা এখন না বুঝতে পারলেও পরে বুঝতে পারবে। আর রোকসানার মাকেও কতদিন ধরে বলে আসছি চলে যেতে। যাবে কেন? খেতে-পরতে পেলে কেউ কি যেতে চায়?

রোকেয়া কিছু না বলে চিন্তা করল, শায়লা শাশুড়ীর সঙ্গে তাল দিয়ে চলছে।

কয়েকদিন পর এক বিকেলে রোকেয়ার ছোট ভাই বাহাদুর এলে রোকেয়া বাপের বাড়ি চলে যেতে চাইল।

শায়লা জানতে পেরে বলল, বুবু তুমি যেও না। আম্মা তো প্রায়ই তোমাকে ঐসব বলে থাকেন।

রোকেয়া বুঝতে পারল, সে চলে গেলে সংসারের সব কাজ শায়লাকে করতে হবে। তাই বাধা দিচ্ছে।

তখন তার বিগত দিনের কথা মনের পাতায় ভেসে উঠল। সে থাকলে হানুফা বিবি মেজ বৌকে কোনো কাজ করতে দেন না। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, সব কাজ রোকসানার মা করবে। তুমি করতে যাবে কেন? তিনি মেজ বৌকে সঙ্গে নিয়ে বসে বসে গল্প করেন। আর রোকেয়া চাকরাণীর মত খাটে। শায়লা মাঝে মাঝে এটা-সেটা করতে

গেলে হানুফা বিবি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যান। একদিনের ঘটনা, রোকেয়ার তখন খুব জ্বর। কিছু খেতে পারে না। পরের দিন সকালে বিছানা থেকে উঠে রান্না ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসল। সেখানে হানুফা বিবি শায়লাকে নিয়ে চা-নাস্তা খাচ্ছিলেন। রোকেয়াকে বসে থাকতে দেখেও কেউ খেতে ডাকল না। হানুফা বিবি খাচ্ছেন আর কি কথা নিয়ে হাসাহাসি করছেন। রোকেয়া আর বসে থাকতে পারল না। রুমে গিয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল।

রোকেয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে শায়লা বলল, বুবু, তুমি কি আমার কথা রাখবে না?

শায়লার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে রোকেয়া বলল, না, আমি এখন আর কারো কথা শুনব না। তারপর সে বাহাদুরের সাথে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

তাই দেখে হানুফা বিবি বললেন, এভাবে যেতে পারবি না। তোর বাবাকে দু'-পাঁচজন লোক নিয়ে আসতে বল। তাদের সামনে তোকে চিরকালের মত বিদেয় করব। এখন তো আমি তোকে যেতে বলিনি।

রোকেয়া বলল, পাঁচজনকে লাগবে না; আর আপনি এখন যেতে না বললেও কত হাজার বার বলেছেন। যাইনি বলে কয়েকবার হাত ধরে বের করে দিয়েছেন। আজ আবার লোকজনদের জানাবার কি দরকার?

হানুফা বিবি তাড়াতাড়ি ছোট জাকে ডেকে এনে বললেন, দেখ, রোকসানার মা এখন বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছে; কিন্তু তোমরা আবার পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। আর সেও যেন আমাকে দোষ দিতে না পারে, তাই তোমাকে ডেকে আনলাম।

হানুফা বিবির ছোট জা রোকেয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

রোকেয়া বলল, ছোট মা বিশ্বাস করুন, এখানে আমার আর একদণ্ড মন টিকছে না। খুব অস্থির লাগছে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরকম হচ্ছে কেন? তোমাকে কি কেউ তাবিজ করেছে?

রোকেয়া বলল, তা আমি বলব কি করে?

হানুফা বিবি বলে উঠলেন, এসব আমার বদনাম করার জন্য বলছে।

চাচি শাশুড়ী হানুফা বিবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যেতে চাচ্ছে যাক। তোমার বদনাম করে আর কি করবে? ওর তো আর বিয়ে হবে না।

হানুফা বিবি বললেন, না না, এখন যেতে পারবে না। গেলে পাঁচজনের সামনে একেবারে যাবে।

চাচি শাশুড়ী বললেন, বৌ জোর করে গেলে, তুমি কি ধরে রাখতে পারবে?

হানুফা বিবি রোকেয়াকে বললেন, একান্ত যদি যাও, তবে আমার কোনো বদনাম করতে বা দোষ দিতে পারবে না।

চাচি শাশুড়ী বললেন, তুমি বললেই কি আর না বললেই কি? তোমার বদনাম যেমন হবে, তেমনি সবাই দোষও দিবে। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

রোকেয়া তৈরি হয়েছিল। শাশুড়ীকে সালাম করার জন্য এগিয়ে আসতে আসতে বলল, আপনাদের বদনাম বা দোষ কোনোদিন দেব না। সবই আমার তক্বদির। তারপর বসে পায়ে হাত দিতে গেল।

হানুফা বিবি তাকে ঠেলে ফেলে দিলেন।

রোকেয়ার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে রোকসানাকে বলল, যাও দাদিকে সালাম কর।

রোকসানা সালাম করতে গেলে হানুফা বিবি তাড়াতাড়ি করে বাথরুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন।

রোকসানা বলল, দাদি তো বাথরুমে চলে গেল। সালাম করব কি করে?

রোকেয়া বলল, দাঁড়াও উনি একটু পরে বেরিয়ে আসবেন।

প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে যেতেও যখন হানুফা বিবি বাথরুম থেকে বার হলেন না তখন রোকেয়া রোকসানাকে নিয়ে বাহাদুরের সাথে বাপের বাড়ি চলে গেল।

বাপের বাড়িতে এসে রোকেয়া বাবা-মাকে জানাল, সে আর কখনো শ্বশুর বাড়ি যাবে না।

শাহেদ আলী বললেন, তোকে তো আমি অনেক আগেই সেকথা বলেছিলাম।

মেহেরুন্নেসা বললেন, জামাই এসে যদি নিয়ে যেতে চায়?

শাহেদ আলী বললেন, জামাই যদি রোকেয়াকে নিয়ে অন্য জায়গায় আলাদা সংসার করতে পারে, তাহলে পাঠাব, নচেৎ পাঠাব না। আগে জামাই আসুক, তারপর যা করার করা যাবে।

রোকসানাকে পেয়ে এ বাড়ির সবাই খুশি। কারণ এ বাড়িতে আর কোনো ছোট ছেলেমেয়ে নেই। জাভেদের শুধু দুটো ছেলেমেয়ে। মনোয়ারা ও মানিক। তারা বড় হয়ে গেছে।

রোকেয়া বাপের বাড়িতে চলে আসার পর স্বামীকে সবকিছু জানিয়ে পত্র দিল।

হারুন পত্র পেয়ে টেলিফোন করে রোকেয়াকে বলল, তুমি যা করেছ, তা ভালোই করেছ। আমি তোমাকে মাঝে মাঝে টেলিফোন করব, পত্র দেব, টাকা-পয়সাও পাঠাব। তুমি কোনো চিন্তা করো না।

রোকেয়া বলল, তুমি দেশে আসছ না কেন? যত তাড়াতাড়ি পার কয়েকদিনের জন্য হলেও আস। কতদিন তোমাকে দেখিনি। আমার কিছু ভালো লাগছে না।

হারুন বলল, তোমাদের জন্য আমারও মন খুব অস্থির হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোম্পানী কিছুতেই ছুটি দিচ্ছে না। তবু আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এবার ছাড়ছি, পত্রে সবকিছু লিখে জানাব। তারপর সালাম বিনিময় করে ফোন ছেড়ে দিল।

এরপর থেকে হারুন মাঝে মাঝে রোকেয়াকে টেলিফোন করে, পত্র দেয় এবং টাকা-পয়সাও পাঠায়। এভাবে দিন, মাস ও বছর গড়িয়ে চলল।

একদিন জুলেখা রোকেয়াকে বলল, মেজ আপা, এবার রোকসানাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও।

রোকেয়া বলল, এখন রোকসানা ছোট, আর একটু বড় হোক তখন ভর্তি করব।

জুলেখা শুনল না, সে নিজে রোকসানাকে ভর্তি করে দিল।

রোকেয়া শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে আসার কিছুদিন পর থেকে হারুনের ছোট ভাইয়েরা এসে মাঝে মাঝে রোকসানাকে নিয়ে যায়। কয়েকদিন রেখে আবার দিয়েও যায়। এভাবে পাঁচ-ছ'মাস পরে একবার রোকসানাকে নিয়ে গিয়ে প্রায় পনের বিশ দিন রেখেছিল। রোকেয়া মেয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠল। শেষে তার চাচাতো ভাই দুলালকে রোকসানাকে নিয়ে আসার জন্য মুন্সীরহাটে পাঠাল। কিন্তু তারা রোকসানাকে দুলালের সাথে দিল না। বরং তাকে যাতা বলে ফিরিয়ে দিল। কিছুদিন পর রোকেয়া বাহাদুরকে পাঠাল। তাকেও তারা যাতা বলে ফিরিয়ে দিল। এমন কি তাকে রোকসানাকে দেখতেও দিল না। তার উপর বলে দিল, রোকসানা তাদের মেয়ে তাদের কাছে থাকবে। এভাবে একমাস পার হয়ে যেতে মেয়ের জন্য রোকেয়া আরো অস্থির হয়ে পড়ল।

একদিন রোকেয়ার চার নাম্বার দেবর মজিদ রোকসানাকে এক ডাক্তারখানায় বসিয়ে রেখে বাজার করতে গিয়েছিল।

সেই পথ দিয়ে রোকেয়ার মেজ ভাই বখতিয়ার বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ রোকসানাকে ডাক্তারখানায় একা বসে থাকতে দেখে তার কাছে গেল।

রোকসানা মামাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলল, মেজ মামা, আমাকে আম্মুর কাছে নিয়ে চল। আমি দাদিদের বাড়িতে আর থাকব না।

বখতিয়ার তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার সঙ্গে এখানে এসেছ?

রোকসানা বলল, মজিদ চাচুর সঙ্গে। সে বাজারে গেছে।

তখন বখতিয়ার তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এল।

ঘরে এসে রোকসানা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আম্মু, আমি আর দাদিদের বাড়িতে যাব না।

রোকেয়া এতদিন পরে মেয়েকে পেয়ে বুকে চেপে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, না মা আমিও আর তোমাকে সেখানে পাঠাব না।

এদিকে মজিদ বাজার থেকে ফিরে এসে ডাক্তারখানায় রোকসানাকে দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করল। শেষে না পেয়ে ভাবল, তাহলে ওর মামারা কেউ ওকে একা পেয়ে কি এখান থেকে নিয়ে গেছে? একথা ভেবে রোকসানার মামাদের বাড়িতে গেল। ভাবির কোলে রোকসানাকে দেখে মজিদ বলল, এভাবে চুরি করে আনার কি দরকার ছিল? ঘর থেকে আনতে গেলে আমরা কি মেয়েকে দিতাম না?

রোকেয়া দেবরকে খুশি করার জন্য মাকে বলল, মেজ ভাইয়ের কি কাণ্ড দেখ আম্মা, সে আমার দেবরকে না বলে ডাক্তারখানা থেকে রোকসানাকে নিয়ে চলে এসেছে। আমার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তো আনতে পারত? তারপর মজিদকে আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় দিল।

কয়েকদিন পরে মজিদ রোকসানাকে নিয়ে যেতে এলে রোকেয়া বলল, তোমরা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আর দিয়ে যাও না। কেউ আনতে গেলে তার সাথেও পাঠাও না। আমি রোকসানাকে আর ওখানে পাঠাব না।

এরপর একদিন হারুনের দু'ভাই হানিফ ও মজিদ রোকসানাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্কুলে গেল। কিন্তু সেদিন রোকসানা স্কুলে যায়নি। তাই তারা ফিরে গেল।

সেদিন রোকেয়ার এক চাচাতো বোন এসে বলল, জান আপা, আজ স্কুল থেকে রোকসানাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওর দুই চাচা এসেছিল, রোকসানাকে না পেয়ে ফিরে গেছে।

তারপর থেকে রোকেয়া রোকসানাকে আর স্কুলে পাঠাল না। নিজে তাকে ঘরে পড়াতে লাগল। শুধু পরীক্ষার সময় শাহেদ আলী নিজে নাতনিকে সাথে করে স্কুলে নিয়ে যান নিয়ে আসেন। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগল।

রোকসানার বয়স এখন সাত বছর। সে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। একদিন দুবাই থেকে হারুনের চিঠি এল। রোকেয়া চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

প্রিয়তমা আমার,

আমি তোমার বিরহে দিন-রাত অস্থির হয়ে আছি। এই সুদূর বিদেশে কেবলই তোমার শেফালি শুভ্র মুখখানা মনে পড়ে। কয়েকদিন ধরে তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় তোমার চিঠির আশায় প্রহর গুনছিলাম। আজ তোমার প্রেরিত টক-ঝাল-মিষ্টি মেশান চিঠি পেয়ে আমার তৃষ্ণা মিটল। তবে দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? যাক, তুমি ভালো আছ জেনে আমার মরা গাছে যেন ফুল ফুটল। শরীরে ও প্রাণে স্পন্দন জাগল। আর তুমি

কি না, আমি তোমাকে ভুলে গেছি বলে অভিযোগ করেছ। সত্যি কি তোমাকে ভুলে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব? গ্রহ ছাড়া কি উপগ্রহ থাকতে পারে? তুমি যে আমার মরুদ্যানের সজল মৌসুমী বায়ু। তোমার লক্ষ লক্ষ টন পানি চুষে এ মরুদ্যান সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে ভরপুর হবে। সেই আমি কি করে তোমায় ভুলে থাকব? ছায়া বরং কায়ার মায়ায় বিস্মৃত হয়ে পিছু হটতে পারে, পূর্বদিকে সূর্য না উঠে পশ্চিম দিকে উঠতে পারে, কিন্তু আমি কোনোদিন তোমাকে ভুলতে পারব না। আসলে কি জান রোকা, তোমার কাছে যাওয়ার জন্য আমার মন উন্মাদ হলে কি হবে, যখন সংসারের অশান্তির কথা মনে পড়ে, তখন আর দেশে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না। তবে এবার ঠিক যাব। তুমি কোনো চিন্তা করো না। মামণি রোকসানার জন্যও আমার মন খুব অস্থির হয়ে উঠেছে। ওকে আমার আন্তরিক দো'য়া ও স্নেহচুম্বন দিও। পরিশেষে আল্লাহপাকের দরবারে তোমাকে ও রোকসানাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আরামে রাখার জন্য দো'য়া করছি। সবশেষে তোমার তুলতুলে দু'গালে কয়েকটা চুমো দিলাম।

ইতি

হারুন

রোকেয়া হারনের চিঠি পড়ে তার উত্তর লিখল,

ওগো প্রাণ সজনী,

তোমাকে জানাই আমার শতকোটি সালাম ও প্রেম-ভালবাসা। কেমন আছ? নিশ্চয় ভালো? আল্লাহপাকের কাছে আমিও তাই কামনা করি। আজ তোমার উচ্ছ্বাস ও আনন্দ মেশানো চিঠি আমার হস্তগত হল। চিঠিটা পড়ে আমার উষ্ণমনে এক পশলা বৃষ্টি বয়ে এনেছে। নিঃসঙ্গতার বেদনা ও জ্বলন্ত বিরহের মাঝে সেই বৃষ্টি শান্তির ধারা বর্ষিত হয়েছে। ওগো প্রাণপ্রিয় স্বামী, তোমার স্মৃতি ও ভালবাসা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রেরণা জোগাচ্ছে। তুমি আমাকে কতটুকু ভালবাস জানি না, আমি কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি। তুমি যাদুমাখা চিঠি দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে অভিনয় করে চলেছ। এটা কি স্বামীর কর্তব্য? না এটা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার স্বরূপ? আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ আট বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে আমরা একত্রে বাস করেছি ছয়-সাত মাস। আর বাকি সময়গুলো বিরহের মধ্যে কেটেছে। কিসের ভয়ে আসছ না? তুমি না পুরুষ? তুমি এসে আমাদের সমস্যাটা সমাধান করে যাও। সবাই যেন সুখে থাকে সে ব্যবস্থা কর। তোমার আম্মা তো আমাকে অপছন্দ করেই। এখন তুমি যদি আমাকে নিয়ে সংসার করতে না চাও, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি চাই তোমাদের সকলের সুখ-শান্তি। সংসারে অশান্তির কারণে তুমি স্ত্রী ও মেয়েকে ফেলে রেখে বিদেশে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে–এটা কখনো হতে পারে না। তুমি ফিরে আস। কপালে যা আছে, তা না হয়ে যাবে না। 'অদৃষ্টের লিখন কে করিবে খণ্ডন?' এদিকে আমার শরীর একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। যাকে বলে জীবন্ত কংকাল। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, রোকসানার কথাও কি তোমার মনে পড়ছে না? সে তোমাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করে। তার কথা মনে করে হলেও তোমার একবার দেশে আসা উচিত। বিশেষ আর কি লিখব। আল্লাহপাকের দরবারে দো'য়া করি, তিনি যেন তোমায় সুখে রাখেন।

ইতি

তোমার অভাগিনী রোকা।

রোকেয়ার শরীর দিনের পর দিন জীর্ণ হয়ে পড়ছে। একে স্বামীর ও সংসারের চিন্তা। তার উপর রোকসানা হওয়ার দু'বছর পর থেকে তার পেটে এক ধরনের ব্যথা শুরু হয়েছে। আজ প্রায় ছ'বছর হতে চলল, প্রতিমাসে একবার করে কয়েক দিন ব্যথাটা

হয়। প্রথম তিন দিন তো পেটের ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। এমনভাবে পেটে কামড় দেয়, যা সে বলতে পারে না। পায়খানা করতে খুব কষ্ট হয়। মনে হয়, প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তিন দিন পর পেট ফুলে যায়। পাঁচ-ছ'দিন পর ভালো হয়ে যায়। এতদিন কত হোমিওপ্যাথিক, এ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী ও হেকিমি চিকিৎসা করিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এখন সেই ব্যথা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

রোকেয়ার বড় বোন রূপার স্বামী বশির কুমিল্লা টাউনে একটা বড় দোকান দিয়েছে। বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে অসুবিধে হয় বলে সেখানে বাসা ভাড়া করে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

একদিন রূপা বাপের বাড়ি বেড়াতে এল। এসে রোকেয়া অবস্থা দেখে বলল, কিরে তোর শরীর যে একদম ভেঙে গেছে। ভালো করে চিকিৎসা করাচ্ছিস না কেন? সে বোনের অসুখের কথা জানে।

রোকেয়া বলল, চিকিৎসা তো কম করাছি না; কোনো উপকারই হচ্ছে না।

রূপা বলল, তোকে এবারে আমি কুমিল্লা নিয়ে যাব। তোর দুলাভাইকে বলে বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাব।

রোকেয়া বলল, আমার মনে হয়, এ রোগ আর ভালো হবে না। শুধু শুধু টাকা খরচ করে কোনো লাভ নেই।

রূপা বলল, তোর কথা ঠিক নয়। আল্লাহর হুকুম যতদিন না হয়, ততদিন কারো রোগ ভালো হয় না। ওষুধ খেলেও কাজ হয় না। কারণ ওষুধের উপরও আল্লাহর হুকুম থাকে।

রূপা কয়েকদিন থেকে যাওয়ার সময় জোর করে রোকেয়াকে কুমিল্লা নিয়ে এল। তারপর একজন বড় ডাক্তারের কাছে রোকেয়াকে দেখাল।

ডাক্তার রোকেয়াকে পরীক্ষা করে তিন মাসের ওষুধ দিয়ে বললেন, এগুলো শেষ করার পর দেখা করবেন। আর দু'চারদিনের মধ্যে মাথার, পেটের ও বুকের এক্স-রে এবং রক্ত, প্রস্রাব ও পায়খানা পরীক্ষা করাতে বললেন।

রোকেয়া আপার বাসায় সাত-আট দিন থেকে ডাক্তারের কথামত সবকিছু করিয়ে ডাক্তারকে দেখাল।

ডাক্তার সব রিপোর্ট দেখে বললেন, ঠিক আছে, আপনাকে যে ওষুধগুলো খেতে দিয়েছি, ঐগুলো খেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

রোকেয়া আরো দু'দিন থেকে বদরপুর ফিরে এল। তিন মাস ওষুধ খেয়েও কোনো কাজ হল না। তারপর সেই ডাক্তারের কাছে আর যাওয়া হল না। কারণ রূপা চিঠি দিয়ে জানাল, তিনি বিদেশ চলে গেছেন।

হারুনের সেজ ভাই হোসেন দু'বছর হল বিদেশ গিয়েছিল। এর মধ্যে সে দেশে ফিরল। একদিন হোসেন ভাবি ও ভাইজীকে দেখার জন্য বদরপুর এল।

বাহাদুর সদরে ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে বলল, বিয়াই, কেমন আছেন?

হোসেন বলল, ভালো আছি। তোমরা সব ভালো আছ?

বাহাদুর বলল, হ্যাঁ, ভালো আছি। তারপর তাকে সদরে বসতে বলে বলল, আপনি বসুন, আমি মেজ আপাকে ডেকে দিচ্ছি। একথা বলে সে বাড়ির ভেতরে গিয়ে রোকেয়াকে বলল, মেজ আপা, হোসেন বিয়াই এসেছে। তাকে আমি সদরে বসতে বলেছি।

রোকেয়া রোকসানাকে সঙ্গে নিয়ে সদরে হোসেনের কাছে এল।

হোসেন সালাম দিয়ে বলল, ভাবি কেমন আছ?

রোকেয়া সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমি কেমন আছি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা সব কেমন আছ বল।

হোসেন বলল, আমরা ভালো আছি। কিন্তু তোমার শরীর এত ভেঙে গেল কেন?

রোকেয়া ম্লান হেসে বলল, সেকথা তোমার জেনে কোনো লাভ নেই। যার লাভ ছিল সে যখন কোনো খোঁজ-খবর রাখছে না তখন আর বলে কি হবে? যাক,তোমার বড় ভাইয়ার কি খবর? সে দেশে আসছে না কেন?

হোসেন বলল, তা আমি কি করে বলব? বড় ভাইয়ার কথা থাক। আমি তোমাকে ও রোকসানাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি যাবে কিনা বল?

রোকেয়া বলল, আমি যাব না। তুমিও একদিন আমাকে বাপের বাড়ি চলে আসতে বলেছিলে। এখন আবার যেতে বলছ কেন?

হোসেন বলল, আমি তোমার কাছে সে কৈফিয়ত দিতে আসিনি। তুমি যাবে কিনা বল?

রোকেয়া বলল, আমিও তোমাকে সেসব কথা বলতে চাই না। তুমি বলতে বাধ্য করলে, তাই বললাম।

হোসেন বলল, তাহলে তুমি যাবে না?

রোকেয়া বলল, না যাব না।

হোসেন বলল, তাহলে রোকসানাকে নিয়ে যাই।

রোকেয়া বলল, না রোকসানাও যাবে না।

হোসেন বলল, কথা দিচ্ছি, রোকসানাকে কয়েকদিন পরে আমি নিজেই দিয়ে যাব।

রোকেয়া বলল, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

হোসেন আর কিছু না বলে চলে গেল।

মাসখানেক পর হোসেন আবার একদিন এসে রোকসানাকে দেখে গেল। তার তিন-চার মাস পর বিদেশ যাওয়ার আগের দিন আর একবার রোকসানাকে দেখার জন্য এল। কিন্তু সেদিন রোকসানা বাড়িতে ছিল না। তার নানির সাথে বেড়াতে গিয়েছিল। তাই হোসেন তাকে দেখতে পেল না।

হোসেন বিদেশে গিয়ে বড় ভাই হারুনকে বলল, আমি রোকসানাকে দেখতে বদরপুর গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাবি তাকে দেখা করতে দেয়নি। লুকিয়ে রেখে বলল, সে বেড়াতে গেছে।

কিছুদিন পর হারুন রোকেয়াকে চিঠি দিয়ে বলল, রোকা তুমি কি চিরকাল পাগলামি করবে? হোসেন রোকসানাকে দেখতে গেলে, না দেখিয়ে লুকিয়ে রাখলে কেন?

স্বামীর চিঠি পড়ে রোকেয়ার খুব দুঃখ হল। ভাবল, চিঠিতে কিছু লিখলে ভাববে, আমি সাফাই গাওয়ার জন্য মিথ্যে করে লিখেছি। সে বিদেশ থেকে আসলে রোকসানার মুখ দিয়েই সত্য-মিথ্যা যাচাই করাব। রোকসানা এখন সবকিছু বুঝতে শিখেছে। সে-ই তার বাবাকে বলবে। এসব ভেবে রোকেয়া স্বামীর চিঠির উত্তর দিল না।

হারুন রোকেয়ার কাছ থেকে উত্তর না য়ে আরো দু'-তিনখানা চিঠি দিল।

রোকেয়া তবুও উত্তর দিল না। কারণ সে প্রত্যেক চিঠিতে লিখে, আমি আগামী মাসে আসব। অথবা ঈদের পর আসব,না হয় কোরবানীর ঈদের পর আসব। এই আসব আসব করে আজ পাঁচ-ছ'বছর পার করে দিয়েছে। তবুও আসল না। রোকেয়ার মনে হল, আসবার কথা লিখে আমাকে সান্ত্বনা দেয়। আসলে সংসারের অশান্তির ভয়ে সে আসবে না।

হানুফা বিবিকে তার সব ছেলেই ভয় করে। ভয় করে না শুধু সেজ ছেলে হোসেন। কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় রোকেয়াকে কোনো কিছু জানানো

হয়নি। বিয়ের পরে হোসেন মাকে বলল, আম্মা, সংসারের ব্যাপারে আমাকে ও আমার বৌকে এবং আমার শ্বশুর বাড়ির কাউকে ভালো-মন্দ কোনোকিছু বলবে না। যেদিন বলবে, সেদিন তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়ব। সেই ভয়ে হানুফা বিবি তেমন বেশি কিছু না বললেও মাঝে-মধ্যে বৌকে বকাঝকা করতে ছাড়েননি। ঐ যে লোকে বলে, 'ইজ্জত যায় না ধুলে, আর স্বভাব যায় না মরলে।'

রোকসানা একদিন মাকে বলল, আম্মু, আমার আব্বু কোথায়? আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি।

রোকেয়া বলল, মামণি, তোমার আব্বু বিদেশ গেছে। তুমি তখন ছোট ছিলে। তিনি তোমার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় ও কত খেলনা নিয়ে আসবেন।

রোকসানা বলল, আমার অনেক জামা-কাপড় আছে আর লাগবে না। তুমি আব্বুকে আসতে বল। সব ছেলেমেয়েরা তাদের আব্বুকে আব্বু বলে ডাকে। আমারও ডাকতে ইচ্ছে হয়।

রোকেয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলল, ঠিক আছে, আমি চিঠিতে তোমার কথা লিখে তাকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে বলব।

রোকেয়ার চাচাতো ভাইয়ের তুষার নামে একটা সাত-আট মাসের ছেলে আছে। রোকসানা তাকে নিয়ে সারাদিন থাকে। একদিন সে তার মাকে বলল, আম্মু, তুষারের মত একটা ভাইয়া আমাকে এনে দেবে। আমি তাকে নিয়ে খেলা করব।

রোকেয়া বলল, তোমার ঐরকম ভাইয়া কিনতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা আমার কাছে নেই।

রোকসানা বলল, তুমি আব্বুকে চিঠি দিয়ে অনেক টাকা পাঠাতে বল। আব্বু টাকা পাঠালে ঐরকম ভাইয়া কিনে নিয়ে আসবে।

রোকেয়া বলল, তাই হবে।

রোকসানা আবার বলল, আচ্ছা আম্মু, তোমার বাচ্চা হয়নি কেন? তুষারের মত একটা বাচ্চা হলে তাকে আমি কত আদর করতাম। সে আমাকে আপা বলে ডাকত, তাই না আম্মু?

মেয়ের কথা শুনে রোকেয়ার চোখে পানি এসে গেল। তাকে বুকে চেপে ধরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, আল্লাহ দেননি, তাই হয়নি। আল্লাহ যখন দেবেন, তখন তুমি আদর করো কেমন!

রোকসানা মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

নয়

এদিকে রোকেয়া অসুখে ভুগে ভুগে কংকাল হয়ে গেল। নিজের ও মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে করে আরো কাহিল হয়ে পড়ল। এক-এক সময় ভাবে, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ অনেক ভালো। কয়েকবার আত্মহত্যা করার কথা চিন্তাও করেছে। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ ভেবে তা করতে পারেনি। বাপের বাড়ি এসেছে চার-পাঁচ বছরেরও বেশি হয়ে গেল। কতদিন আর বাপ-ভাইয়ের ঘাড়ে বসে খাব। হারুন তাকে চিঠিপত্র দিয়ে সান্ত্বনা দিলেও ইদানিং টাকা-পয়সা পাঠায়নি। সে প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, 'হে আল্লাহ, তোমার ভেদ তুমি জান। আমার কি হবে, তাও তুমি জান। আমাকে এভাবে দগ্ধে দগ্ধে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ, তা আমি জানি না। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। হয় আমাকে সহ্য করার ক্ষমতা দাও, 'নচেৎ আমাকে এ দুনিয়া থেকে তুলে নাও।' এর মধ্যে রোকেয়া নিজের অসুখের কথা বিস্তারিত লিখে পর

পর কয়েকখানা চিঠি দিল। কিন্তু হারুনের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে রোকেয়া আরো একখানা চিঠি লিখল–

ওগো প্রাণের স্বামী,

আমার হাজার হাজার সালাম তোমার পবিত্র কদমে স্থান দিও। আর হতভাগিনী রোকসানার সালাম নিবে। আশাকরি ভালো আছ। আমরাও কোনো প্রকারে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

প্রিয়তম, বেশ কিছুদিন থেকে তোমাকে চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাচ্ছি না। এর কারণ জানালে বাধিত হব। বিয়ের আগে বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমাকে পছন্দ কর। বিয়ের পর জানতে পারলাম, তুমি শুধু পছন্দ করনি, তোমার আম্মার অমতে একরকম জোর করে আমাকে বিয়ে করেছ। কারণ তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস। বিয়ের পর আমিও তা বুঝতে পেরে তোমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবেসে ফেলি। সেজন্যে তোমার আম্মার হাজারো অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করে সেই ভালবাসা আজও বাঁচিয়ে রেখেছি। তুমিও আমাকে তোমার আম্মার সবকিছু সহ্য করে সবর করতে বলেছিলে। আমি তোমার সুখের জন্য আজ আট বছরের বেশি হতে চলল, নিশ্চল পাথরের মত চুপ করে সহ্য করে রয়েছি। কিন্তু তুমি স্বামীর কর্তব্য পালন করতে পারনি। বলতে পার প্রিয়, এত বছর তোমার মুখের দিকে চেয়ে সবর করে কি পেলাম? অবশেষে সবর করতে না পেরে আজ কয়েকটা কথা বলব। অন্যায় হবে কিনা জানি না, হলে ক্ষমা করে দিও।

তোমার আম্মা রাজি ছিলেন না, তবু আমাকে বিয়ে করলে কেন? তুমি তো তোমার আম্মা কেমন তা নিশ্চয় জানতে? তারপরও জোর করে এ কাজ করা উচিত হয়েছে? যদি আম্মার কথা তখন মেনে নিতে, তাহলে তোমাকে ও আমাকে এত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করতে হত না। তোমার জিদের জন্য তুমি বেঁচে থাকলেও আমি মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি। আর তোমার-আমার একমাত্র সন্তান রোকসানা বাপ থেকেও এতিমের মত মানুষ হচ্ছে। সে বার বার তার আব্বার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি বলি বিদেশে আছে, তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য আমাকে চিঠি লিখতে বলে। আমি ওকে বলি, তোমার আব্বুকে তোমার কথা বলে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি। কতদিন আর ওকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে ভুলিয়ে রাখব? আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি তোমার মায়ের পছন্দমত আরেকটা বিয়ে করে সুখের সংসার পাত। এখনো আবার সেই কথা বলছি, তুমি উঁচু ঘরের ধনী কন্যাকে বিয়ে করে সংসারের সবাইকে নিয়ে সুখে ও শান্তিতে থাক। আমি যেমন আছি তেমন থাকব। তোমাদের সংসারে গিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করব না। এ জগতে তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার প্রতি আমার আর কোনোদিন কোনো কিছু দাবি থাকবে বা। তুমি এখন স্বাধীন। এবার একটা কেন, পারলে চারটে বিয়ে করতে পার। কিন্তু এ জগতে তোমাকে মুক্তি দিলেও পরজগতের জন্য নয়, আল্লাহর কাছে এর ন্যায় বিচার চাইব। তোমাকে আমি মাফ করলেও আমার অন্তর কোনোদিন করবে না। কারণ তুমি ভালো মানুষের মুখোশ পরে আমার সর্বনাশ করেছ। আরো অনেক কিছু লিখার ছিল। কিন্তু মন চাচ্ছে না। কারণ লিখে কি হবে? তোমার যদি পুরুষত্ব বলে কিছু থাকত, তাহলে স্ত্রীকে ছেড়ে বছরের পর বছর বিদেশে থাকতে পারতে না! আর সবকিছু লিখতে গেলে কয়েক রীম কাগজ লাগবে। যাক, মনের দুঃখে ভালো-মন্দ অনেক কিছু লিখে ফেললাম। নিজ গুণে ক্ষমা করো। আল্লাহপাকের দরবারে তোমার সহি সালামতের দো'য়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

অভাগিনী রোকসানার মা।

রোকেয়া হারুনকে কোনোদিন এভাবে চিঠি দেয়নি। কিন্তু এবারে দিয়েও উত্তর পেল না।

একদিন রোকসানা মাকে কাঁদতে দেখে বলল, তুমি আব্বুর জন্য কাঁদছ কেন? আব্বু এখন আসবে না।

রোকেয়া চোখ মুছে বলল, কেন মামণি, তুমি একথা বললে?

রোকসানা বলল, তুমি খালি আব্বুর জন্য কাঁদ, তাই বললাম। দেখ আম্মু, আমার বিয়ে দিতে আব্বু ঠিক আসবে।

রোকেয়া বলল, তুমি তো এখন অনেক ছোট।

রোকসানা বলল, আমার কি এখন বিয়ে হচ্ছে? যখন বড় হব, তখন আব্বু আসবে বুঝলে?

রোকেয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, তা তো নিশ্চয়ই।

প্রতি বছর বদরপুর ক্লাবে ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হয়। এবছরও হবে। একদিন বখতিয়ার রোকেয়ার হাতে একটা কবিতা দিয়ে বলল, তোর মেয়েকে এটা মুখস্থ করা। ১৬ই ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে ওকে দিয়ে আবৃত্তি করাব।

রোকসানা সেখানে ছিল, মামাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যি বলছ মেজ মামা?

বখতিয়ার বলল, হ্যাঁরে সত্যি।

রোকেয়া রোকসানাকে বলল, মামাকে ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে এস। আমি তোমাকে কবিতাটা আবৃত্তি করতে শিখিয়ে দিই।

অনুষ্ঠানের দিনে রোকেয়া রোকসানাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বখতিয়ারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল।

কয়েকটা ছেলেমেয়ে আবৃত্তি করার পর রোকসানার পালা। সে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমার নাম রোকসানা আক্তার। আমি একটা কবিতা আবৃত্তি করব। কবিতার নাম, 'খেলার প্রিয় সাইদু বাদশা'। লিখেছেন, আলাউদ্দিন চৌধুরী (আলো)।

খেলার প্রিয় সাইদু বাদশা মন বসে না পাঠে,
খেলতে খেলা ফুটবল থাকে সদা মাঠে।
মস্ত বড় খেলুয়াড় হতে চাই জীবনে,
অন্য খেলা খেলে না কখন ভুলে।
শিখতে খেলা যাবে সে বহুদূর জার্মানে,
শিক্ষা শেষে আসবে দেশে চড়ে এক রকেট জানে।
আসার সময় আনবে সাথে হাজার খানেক বল,
দেশটাকে মাঠ বানিয়ে খেলবে খেলা ফুটবল।

কবিতা আবৃত্তি করে রোকসানা একটা খাতাও একটা কলম পুরস্কার পেল।

এর মধ্যে রোকেয়ার বড় বোন রূপা বাপের বাড়ি বেড়াতে এল। রোকেয়াকে দেখে বলল, কিরে তুই যে দেখছি কবরের ধারে পৌছে গেছিস?

রোকেয়া বলল, আল্লাহপাকের যা মর্জি তা কে রোধ করবে?

রূপা কয়েকদিন থেকে ফিরে যাওয়ার সময় রোকেয়াকে সাথে করে কুমিল্লা নিয়ে এল। তারপর আবার একটা বড় ডাক্তারকে দেখাল।

ডাক্তার রোকেয়াকে পরীক্ষা করে এক মাসের ওষুধ দিয়ে বললেন, এগুলো খেয়ে আবার আসবেন।

রোকেয়া এক মাস ওষুধ খেয়ে কোনো উপকার পেল না। তবু আবার সেই ডাক্তারের কাছে এসে সে কথা জানাল।

ডাক্তার আগেকার চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন দেখে আবার রোকেয়াকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললেন, আপনার একটা অপারেশন না করালে এ রোগ ভালো হবে না। অপারেশনের জন্য স্বামীর অনুমতি লাগবে। ডাক্তার আগেই জেনেছেন, রোকেয়ার স্বামী দীর্ঘ কয়েক বছর বিদেশে আছেন। তাই বললেন, আপনার স্বামী যদি দেশে থাকতেন, তাহলে এ রোগ হত না। যাই হোক, অপারেশনটা একটু সিরিয়াস ধরনের। অপারেশনটা না করালে অন্ধ হয়ে যাবেন অথবা ব্রেনের মধ্যে দারুণ এ্যাফেক্ট করবে। যার ফলে আপনি পাগল হয়ে যেতে পারেন। আপনি অতি সত্বর স্বামীকে দেশে আসতে বলেন। উনি যদি একান্ত না আসতে পারেন, তবে অনুমতি চেয়ে পাঠান। মনে রাখবেন, যা কিছু করবেন, তাড়াতাড়ি করবেন। এমনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন। যত শিঘ্রী সম্ভব অপারেশন করান দরকার। ততদিন আগের ওষুধগুলো খেতে থাকুন।

রোকেয়া বদরপুর ফিরে এসে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বামীকে চিঠি লিখল–

প্রিয়তম,

পত্রের প্রথমে তোমাকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শতকোটি সালাম ও ভালবাসা। ভালবাসা তুমি নিতে না চাইলেও শেষবারের মত সব উজাড় কর পাঠালাম। গতবার চিঠি লিখার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতদিন বেঁচে থাকব, আর কোনোদিন তোমাকে চিঠি দিয়ে বিরক্ত করব না। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে দিতে হল। আশাকরি আল্লাহর ফজলে বেশ ভালোই আছ। নচেৎ এ হতভাগীর কথা তোমার মনে পড়ে না কেন? আমি পরম করুণাময়ের অশেষ করুণায় শুধু প্রাণে বেঁচে আছি। অসুখে ভুগে ভুগে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছি। ডাক্তার বলেছেন, অতি সত্বর অপারেশ করাতে। নচেৎ আমি বেঁচে থাকলেও পঙ্গু হয়ে যাব। অপারেশনের জন্য ডাক্তার তোমার অনুমতি চেয়েছেন, তাই এ চিঠি দেওয়া। তোমার বণ্ডসই অথবা অনুমতি না হলে উনি অপারেশন করবেন না। তাই তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি, তুমি যত শিঘ্রী পার চলে এস। আমি হয়তো আর বাঁচব না। তাই তোমাকে শেষবারের মত একবার দেখতে চাই। তোমার কাছে আমার আর কোনো দাবি নেই। একান্ত যদি আসতে না পার, তবে চিঠি দিয়ে হলেও অপারেশনের অনুমতি দিও। এবার তোমাকে দু'একটা কথা বলব, শুনে তুমি হয়তো দুঃখ পাবে। তবুও না বলে থাকতে পারছি না। সেজন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি। তুমি বোধহয় জান, হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইসলাম প্রচারের জন্য দেশের পর দেশ অভিযান চালিয়েছেন, তখন তিনি মা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্ত্রীরা স্বামীকে ছেড়ে কতদিন থাকতে পারে? মা আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, চার মাস। তখন হযরত ওমর (রাঃ) কাসেদ মারফত বিভিন্ন দেশে অভিযানরত সেনাপতিদের খবর পাঠিয়ে দিলেন, যে সমস্ত সৈন্য চার মাসের অধিককাল বিদেশে রয়েছে, তাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিতে। আর তিনি তাদের স্থলে অন্য সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। শুনেছি হাদিসে আছে, 'স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে চার বছর যোগাযোগ না রাখে, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপনা-আপনি তালাক হয়ে যায়। স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিয়ে করতে পারে।' তুমি আজ পাঁচ-ছ'বছর বিদেশে রয়েছ। ইসলামী আইন মোতাবেক আমাদের বিয়ে কি টিকে আছে? নেই। এ হাদিস জেনে তুমি হয়তো ভাববে, আমি অন্যত্র বিয়ে করতে চাই। অথবা তুমি আমাকে অন্যত্র বিয়ে করার পরামর্শ দেবে। কিন্তু তুমি জেনে রেখ, কোনোটাই আমি চাই না। যদিও তুমি আমাকে আর নিতে না চাও, তবুও আমি আজীবন তোমাকে স্মরণ রেখে কাটিয়ে দেব। তবু ঐরকম চিন্তা

কোনোদিন মনে স্থান দেব না। তুমি আস আর না আস ভাবব, এটাই আমার তক্বদির। বেশি কিছু লিখে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। হয়তো অন্যায় কিছু লিখে ফেললাম, পারলে ক্ষমা করো। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

হতভাগী রোকেয়া।

পুনশ্চ রোকসানা তোমাকে সালাম জানিয়েছে। আর আসার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছে। সে তার আব্বুকে জ্ঞান হবার পর থেকে দেখেনি। দেখার জন্য পাগল হয়ে আছে।

হারুনকে চিঠি দেওয়ার এক মাস পরও যখন দেশে ফিরল না এবং চিঠিও দিল না তখন বাধ্য হয়ে রোকেয়া নিজে বগুসই দিয়ে অপাশেনের প্রস্তুতি নিল। কারণ পেটের যন্ত্রণায় সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল।

অপারেশনের পর রোকেয়া প্রায় দেড় মাস কুমিল্লায় বড় বোন রূপার বাসায় ছিল। এখন সে আগের তুলনায় অনেকটা সুস্থ। কিন্তু দৈহিক সুস্থ হলে কি হবে? স্বামীর চিন্তায় এবং নিজের ও রোকসানার ভবিষ্যতের চিন্তায় মনে একটুও সুখ-শান্তি নেই।

প্রায় এক বছর পর একদিন হোসেন রোকেয়ার বাপের বাড়িতে এল। হোসেনকে দেখে রোকেয়া বলল, কবে বিদেশ থেকে এলে?

হোসেন বলল, দু'দিন হল এসেছি।

রোকেয়া বলল, তোমরা আসছ যাচ্ছ, তোমাদের ভাইয়া আসছে না কেন?

হোসেন বলল, ভাইয়ার খবর ভাইয়া জানে। আমি বলব কেমন করে?

রোকেয়া দেবরের উপর রেগে গেলেও কিছু না বলে চুপ করে রইল।

হোসেন বলল, আমি রোকসানাকে নিতে এসেছি।

রোকেয়া শুনে ভাবতে লাগল, ওরা কি রোকসানাকে একেবারেই নিয়ে যেতে চায়?

ভাবি কিছু বলছে না দেখে হোসেন আবার বলল,তুমি চিন্তা করো না, দু'চার দিন পর আমি রোকসানাকে দিয়ে যাব।

রোকেয়া বলল, আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করি না। নিয়ে গিয়ে যদি আর না পাঠাও, তখন আমি কি করব? সবকিছু হারিয়ে রোকসানাকে নিয়ে বেঁচে আছি। ওকে কেড়ে নিলে বাঁচব কেমন করে? একথা বলে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

হোসেন বলল, আমি কথা দিচ্ছি ভাবি, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

রোকেয়া একথা শুনে আর আপত্তি করলো না। রোকসানাকে কাপড় পরিয়ে তার সাথে পাঠিয়ে দিল।

কয়েকদিন পর হোসেন রোকসানাকে দিয়ে গেল। এভাবে তিন-চারবার নিয়ে গেল, আবার দিয়েও গেল।

শেষবারে রোকসানা ফিরে এসে মাকে বলল, দাদি তোমার জামা-কাপড় নিয়ে আসার জন্য কাউকে পাঠাতে বলেছে।

মেয়ের মুখে একথা শুনে রোকেয়া ছোট ভাই বাহাদুরকে সেখানে পাঠাল।

বাহাদুর মেজ আপার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তার রুমে ঢুকে জামা-কাপড়গুলো এক জায়গায় করে বাঁধল।

এমন সময় হানুফা বিবি রুমে ঢুকে তার হাত ধরে বাইরে এনে বললেন, এসব নিয়ে যেতে হলে তোর বাপকে সাথে করে রোকসানার মাকে আসতে বলবি; তারপর চিরকালের মত তোর আপনাকে বিদেয় করে দেব।

বাহাদুর পনের-ষোল বছর বয়সের ছেলে। প্রথমে সে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর বলল, আপনি এখন আবার একথা বলছেন কেন? আপনিই তো রোকসানার হাতে এগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছেন।

হানুফা বিবি রাগের সাথে বললেন, হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু কিভাবে নিয়ে যেতে হবে, তা তো বলিনি। এখন বললাম।

বাহাদুর বলল, সেজ বিয়াইও তো একদিন এগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য মেজ আপনাকে বলে এল। সেও তো এরকম কিছু বলেনি। আর আব্বাকেই বা আসতে বলছেন কেন? আপনি নিজেই তো মেজ আপাকে বিদেয় করে দিয়েছেন!

হানুফা বিবি বললেন, তুই কুরআন ছুঁয়ে বলতে পারবি, তোর বোনকে আমি বের করে দিয়েছি? সে নিজে চালাকি করে বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার নাম করে চলে গেছে। আমি কি তার মতলব বুঝি না? আমার ছেলের টাকা পয়সা নিয়ে তোদেরকে খাওয়াবার জন্য গেছে। আমার ছেলের টাকায় তোর আইবুড়ো বোনের বিয়ে দেবে, তাও কি বুঝিনি মনে করেছিস?

বাহাদুর বলল, আমরা কি গরিব নাকি যে দুলাভাইয়ের টাকায় আপা আমাদের খাওয়াবে? দুলাভাই তো অনেকদিন আগে থেকে টাকা-পয়সা পাঠায়নি।

সেখানে হোসেন ছিল। সে বাহাদুরের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বলল, বেশি প্যাট প্যাট করবি না, চলে যা, আর কখনো এখানে আসবি না। যা, তোর বাবাকে থানায় গিয়ে মামলা করতে বল। তারপর দেখা যাবে, কে হারে কে জিতে। তোর বাপের কি আর অত টাকা আছে? আমরা টাকার জোরে জিতে যাব।

এমন সময় হারুনের দু'জন বড় চাচাতো বোন এসে দেখে-শুনে বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল, তোর বোন বুঝি বিদেশ চলে যাবে?

তখন বাহাদুর তাদের ব্যবহারে কেঁদে ফেলেছে। কাঁদতে কাঁদতে একথা শুনে রেগে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাবে।

তাদের একজন আবার জিজ্ঞেস করল, তোর বোন শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবে না?

বাহাদুর বলল, না আসবে না।

অন্যজন জিজ্ঞেস করল, তোদের বাড়ি থেকে সোজা চলে যাবে?

বাহাদুর বলল, হ্যাঁ।

বাহাদুরের কথা শুনে হানুফা বিবি বললেন, এবার বুঝেছি, কেন তোকে জামা-কাপড় নিতে পাঠিয়েছে। যা চলে যা, কোনোকিছু নিয়ে যেতে পারবি না। তোর বাপকে বলিস, সে যেন তার মেয়েসহ পাঁচজন লোক নিয়ে এসে একেবারে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাহাদুর ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে রোকেয়াকে সব কথা জানাল।

শুনে রাগে ও দুঃখে রোকেয়ার চোখে পানি এসে গেল। তখন তার স্বামীর উপর ভীষণ রাগ হল। চোখ মুছে ছোট ভাইকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, ওরা জামা-কাপড় নিয়ে আসতে বলেছিল বলে তোকে পাঠিয়েছিলাম, নচেৎ পাঠাতাম না। আর কখনো তোকে পাঠাব না ভাই। তুইও কোনোদিন আর ওদের বাড়ি যাবি না। আর কাঁদিস না চুপ কর। তোকে পাঠিয়ে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে।

বাহাদুর চোখ মুছে বলল, সেকথা আর তোমাকে বলে দিতে হবে না। তারপর সে সেখান থেকে চলে গেল।

দশ

রোকেয়া ছাত্র জীবনে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখার প্রেরণা পেয়েছিল। তখন সে ক্লাস এইটে পড়ে। স্কুলের বাংলার স্যার কবিতা লিখতেন। একদিন রোকেয়া তাকে বলল, স্যার আমাকে একটা কবিতা লিখে দেবেন? কবিতাটা হবে গরিবদের নিয়ে লেখা।

স্যার বলল, এখন সময় নেই, পরে লিখে দেব।

এক মাস কেটে যাওয়ার পরও স্যার কবিতাটা লিখে দিলেন না।

এর মধ্যে রোকেয়া স্যারকে অনেকবার তাগিদ দিয়েছে। প্রত্যেকবারে স্যার একই কথা বলেছেন। শেষে রোকেয়া স্যারের উপর অভিমান করে নিজেই কবিতা লেখার সিদ্ধান্ত নিল। সে প্রথম যে কবিতাটা লিখল, তা সেই স্যারকে নিয়ে–

স্যার তুমি কবি বলে লিখ কত কবিতা,
বিশ্বকবি হলে তুমি, পাব কি আর দেখা?
নিজে নিজে কত লিখ আমার জন্য সময় নাই,
মাসখানেক পিছু ছুটে বিফল হলাম তাই।
ঠিক করলাম স্যারকে আর কবিতার কথা বলব নাহি,
এবার থেকে নিজেই লিখে হব কবির ছাত্রী।

এরপরও রোকেয়া অনেক কবিতা লিখেছিল। সেসব হারিয়ে ফেলেছে। অপারেশনের পর বাপের বাড়িতে এসে নিজেকে ভুলে থাকার জন্য আবার কবিতা লিখতে শুরু করল। কুমিল্লায় আপার বাসায় থাকার সময় বাড়িওয়ালার মেয়ে ফাতেমার সঙ্গে রোকেয়ার বেশ ভাব হয়। তাদের একটা সুন্দর ফুলের বাগান আছে। দু'জনে সেই বাগানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে গল্প করত। বাড়িতে এসে সেই ফুলের বাগানের কথা স্মরণ হতে একটা কবিতা লিখল–

ছোট কিংবা বড় ফুল সুবাস ভরা হলে,
তারই ঘ্রাণে ভ্রমরেরা আসে দলে দলে।
ফুলের মত এমন গুণ যদি থাকে তোমার,
বিশ্ব মাঝে তোমার মত হবে না কেউ আর।
কম বয়সে প্রয়াস কর ফুলের মত হতে।
তোমার কথা শুনবে সবে চলবে তোমার পথে।

তারপর রোকেয়া নিজেকে নিয়ে একটা কবিতা লিখল। কবিতাটির নাম দিল 'প্রেম'।

প্রেম কারো জন্য বেহেশতের ফল,
কিন্তু আমার জন্য চোখের জল।
প্রেম সার্থক, একথা কখনো শুনিনি,
নিজের জীবনেও তার সফলতা দেখিনি।
স্বামীকে চেয়েছি আমি প্রেমের ডোরে বাঁধতে,
কিন্তু হেরে গেছি আমি পারি নাই তাকে ধরতে।
তারপর আবার প্রেম নামক মরীচিকার পিছনে,
তৃষ্ণার্ত বুক নিয়ে কত ছুটেছি জানিনে।
তবু যুগ যুগ ধরে প্রেমিকের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি,
জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে এখন ও বেঁচে আছি।
তাই ভাবি, হয়তো প্রেম কারো জন্য বেহেশতের ফল,
কিন্তু আমার জন্য শুধু চোখের জল।

রোকেয়া দিনের পর দিন অসংখ্য কবিতা লিখে চলল। এভাবে আরো দু'বছর পার হয়ে গেল।

একদিন হঠাৎ হারুনের মেজ ভাই শামসু রোকেয়ার সঙ্গে দেখা করতে এল।

শামসুকে দেখে রোকেয়ার মনটা মুহূর্তের জন্য আনন্দে উথলে উঠল। ভাবল, হারুনও হয়তো এসেছে। সেই ভাবটা সামলে নিয়ে বলল, মেজ ভাই, কি খবর? কবে বিদেশ থেকে এলে? তোমার ভাইয়াও এসেছে নাকি?

শামসু বলল, খবর মোটামুটি ভালো। কিন্তু ভাইয়া আসেনি। আমি গতকাল এসেছি। তোমাকে একটা কথা বলছি ভাবি, শুনে তুমি খুব দুঃখ পাবে, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি আর ভাইয়ার আশায় থেক না। যদি থাক, তাহলে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুমি নতুন সংসার কর।

রোকেয়া শুনে চমকে উঠে কিছুক্ষণ বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তার মনে হল, সে আর এ পৃথিবীতে নেই।

অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমার ভাইয়ার জন্য পাগল হয়ে আছি? সে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারলে আমি পারব না কেন?

শামসু বলল, না ভাবি, তা নয়।

রোকেয়া বলল, তবে তুমি এমন কথা বললে কেন?

শামসু বলল, আমার যা বলা কর্তব্য তা বলেছি। কারণ আমি জানি, ভাইয়া দেশে আর আসতে পারবে না।

রোকেয়া বলল, কেন?

শামসু বলল, ভাইয়া একটা খুব বড় বিপদে পড়েছে। সেই বিপদ থেকে কোনোদিন উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়।

রোকেয়া বলল, কি বিপদ? কিসের বিপদ? তোমার ভাইয়া কি সেখানে আবার বিয়ে করেছে?

শামসু বলল, না।

ঃ তবে কি জুয়া ও মদে আসক্ত হয়ে পড়েছে?

ঃ না, তা নয়।

তবে কি মেয়েদের পেছনে হাঁটছে?

ঃ না, তাও না।

ঃ তবে কিসের বিপদ, আমাকে বলতে হবে।

ঃ না, না, তা তোমাকে বলা যাবে না। সেকথা শোনারও তোমার দরকার নেই। বরং তুমি তোমার জীবন নষ্ট না করে অন্য কোথাও সংসার পাত।

ঃ তুমি বার বার ঐকথা বলছ কেন? তোমার ভাইয়া কি ঐকথা আমাকে বলতে বলেছে?

ঃ না, সে বলেনি। আমি তার বিপদের কথা জানি বলে বলতে এলাম।

ঃ মেজ ভাই, তুমি কি মনে কর আমার একার জীবন নষ্ট হচ্ছে? তোমার ভাইয়ার জীবন নষ্ট হচ্ছে না? আল্লাহপাকের ইচ্ছায় তোমার ভাইয়ার কথা স্মরণ রেখে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, তাতে আমার কোনো কষ্ট হবে না।

ঃ বেশ, তুমি যা ভালো বুঝ কর। আমি যা ভালো বুঝেছিলাম, তা বলে গেলাম। তারপর সে চলে গেল।

শামসু চলে যাওয়ার পর রোকেযা ভাবতে লাগল, হারুনের কি এমন বিপদ হতে পারে, যা সে জেনেও বলতে পারল না?

তাহলে কি সংসারের অশান্তির ভয়ে সে আসছে না? না কি সত্যি তার সেখানে কোনো বিপদ হয়েছে। শেষে ভাবল, তাকে একটা চিঠি দিয়ে আসল ঘটনাটা জানতে চাইবে। পরক্ষণে আবার ভাবল, কি হবেই বা চিঠি দিয়ে? কত চিঠি তো দিলাম। এমনকি মৃত্যুশয্যার খবরও জানালাম। সে সময় মরে গেলে এতদিনে কবরে ঘাস গজাত। কই, তখন তো এল না বা একটা চিঠিও দিল না। এখন বেঁচে আছি শুনে কি আর চিঠি দেবে? এসব কথা ভাবতে তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।

এমন সময় রোকসানা স্কুল থেকে ফিরে মাকে কাঁদতে দেখে বলল, তুমি কাঁদছ কেন আম্মু? মেজ চাচাকে চলে যেতে দেখলাম। সে কি তোমাকে কিছু বলেছে?

রোকেয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আরো কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর সামলে নিয়ে চোখ-মুখ মুছে পাগলের মত মেয়ের দু'গালে চুমো খেয়ে বলল, তোমার চাচা কি তোমাকে কিছু বলেছে?

রোকসানা বলল, না আম্মু, সে তো আমাকে দেখেনি। তুমি এখন আমাকে খেতে দেবে, চল। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

রোকেয়া মেয়েকে খেতে দিয়ে নিজের রুমে এসে খাটে বসে আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করল, "আল্লাহ, তুমি আমার তক্বদির এরকম করলে কেন গো আল্লাহ? আমি কিভাবে সারাটা জীবন কাটাব, তুমি বলে দাও। এত বছর সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে শেষ পর্যন্ত আমি কি পেলাম?" তারপর সে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

❑